‘মিসাইল ম্যান’ খ্যাত বিজ্ঞানী রষ্ট্রপতির আত্মজীবনী দ্বিতীয় গ্রন্থ

টার্নিং পয়েন্টস

এ জার্নি থ্রু চ্যালেঞ্জেস
দি ইন্সপায়ারিং সেকুয়েল টু উইংস অফ ফায়ার

এ.পি.জে. আবদুল কালাম

অনুবাদ
মনোজিৎকুমার দাস

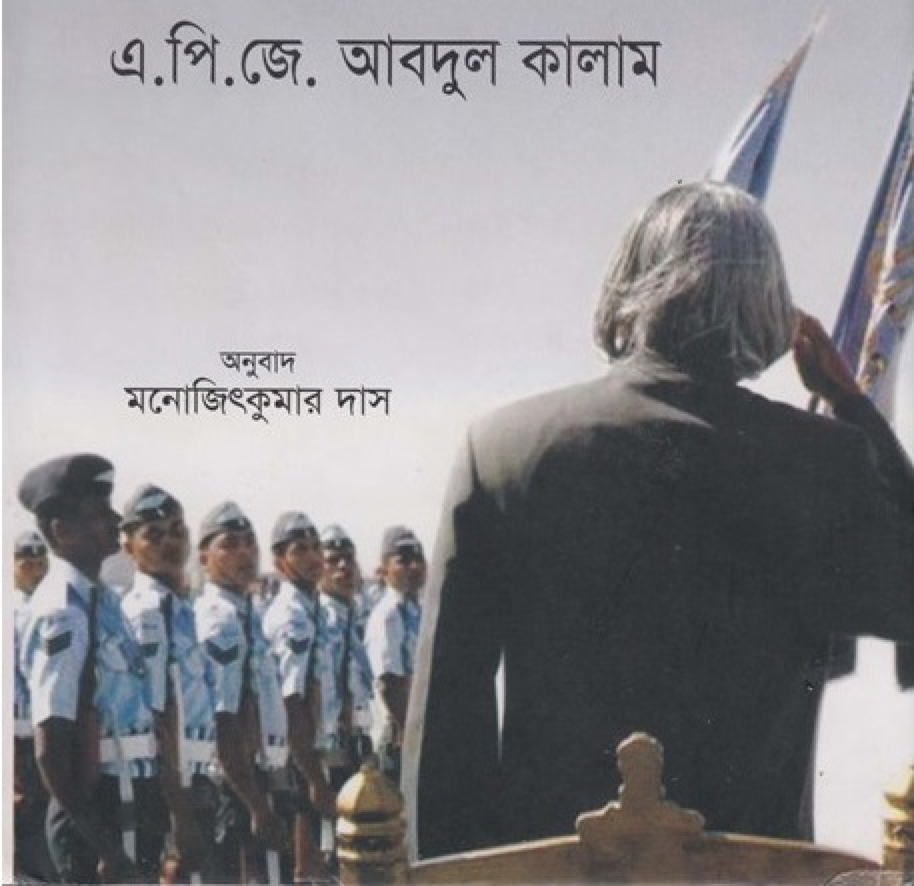

টার্নিং পয়েন্টস

এ জার্নি থ্রু চ্যালেঞ্জেস

দি ইন্সপায়ারিং সেকুয়েল টু উইংস অফ ফায়ার

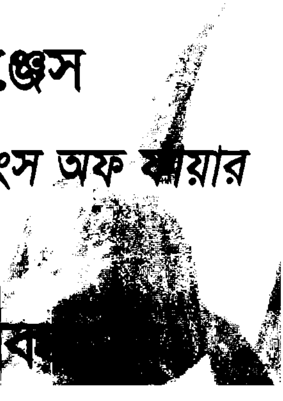

এ.পি.জে. আবদুল ক

অনুবাদকের উৎসর্গ

সাফল্যের জন্য নিবেদিত
সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে।

ভূমিকা

আমার বই **উইংস অব ফায়ার**-এ আমার জীবনের ১৯৯২ সাল পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বইটি ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হবার পর আজ পর্যন্ত বিপুল সারা পেয়েছি। এক মিলিয়ন কপিরও বেশি বই বিক্রি হয়েছে। এই বইয়ের সাহায্যে হাজার হাজার মানুষ তাদের উন্নততর জীবনযাপনের ইতিবাচক দিকনিদর্শন পাওয়ায় আমার হৃদয় আনন্দে আপ্লুত।

কেন আমি টার্নিং পয়েন্টসের মতো বই লিখবার চিন্তাভাবনা করেছি? জবাবে বলা যায় যে আমার গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে উদ্বেগ, দুঃচিন্তা এবং বহু ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্খা। আমি আমার জীবন শুরু করেছিলাম মইয়ের নিচের প্রথম ধাপ থেকে। আমার প্রথম চাকরি ছিল সিনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিসট্যান্ট হিসাবে। ধীরে ধীরে আমি বৃহত্তর দায়িত্বে নিজেকে নিয়োজিত করি। পরিশেষে, আমি ভারতের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করি। নিশ্চিতভাবে গত দশকে অনেক কিছুই ঘটেছে। সেসব ঘটনা থেকে আমি অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

যা হোক, **টার্নিং পয়েন্টস** লেখার অনুষঙ্গটা ছিল ভিন্ন ধরনের। **উইংস অব ফায়ার** বইয়ের অনুপ্রেরণায় এই বইখানা লিখলাম। এই বইখানা মানুষের উপকারে এলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে। প্রকৃতপক্ষে, এই বই থেকে একজন মানুষ কিংবা একটা পরিবারও যদি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে আলোর মুখ দেখতে পারে তবে আমি আশান্বিত হবো। প্রিয় পাঠক, এই বইখানা আপনাদের উদ্দেশ্যে লেখা হলো।

৩০ মে ২০১২
নতুন দিল্লি

এ. পি. জে. আবদুল কালাম

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রিয় বন্ধুরা, আমার বয়স আশি বছর, *টার্নিং পয়েন্টস* দিয়ে আমার বইয়ের সংখ্যা একুশ হলো। আমি নতুন দিল্লির ১০ রাজাজী মার্গে আমার বাসায় বসে এক শীতের সকালে এই বইখানা লিখতে শুরু করি। আমার ব্যক্তিগত সচিব এইচ. শেরিডনের সহায়তায় আমি আমার ডায়েরিগুলো ঘেঁটে দেখতে পেলাম আমার জীবনে সাতটা সন্ধিক্ষণ বা চ্যালেঞ্জ ছিল–রাষ্ট্রপতির অফিস ছাড়ার পর আমি যে কাজে ব্রতী হয়ে সাফল্য লাভ করতে চলেছি তাকে অন্তর্ভুক্ত করলে আটটা সন্ধিক্ষণও ধরা যেতে পারে ।

আমার জীবনব্যাপী যেসব মানুষ আমার প্রতি তাদের স্নেহ আর ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। যারা আমার সাথে সুখ-দুঃখ ও চ্যালেঞ্জের অংশীদার ছিলেন তাদেরকেও জানাই কৃতজ্ঞতা। আমার বইগুলোর পাঠকের সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে পাঁচখানা বইয়ের পাঠকের সংখ্যা ১০০,০০০-এর অধিক। আমার বইয়ের অগণিত পাঠকদের প্রতি প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা রইল। বিশেষভাবে, আমার সাফল্য ও ব্যর্থতার তিরিশ বছরেরও অধিককালের সাথী মেজর জেনারেল আর. স্বামীনাথনকে আমার অন্তরের অন্তর্স্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি আমার বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক। *টার্নিং পয়েন্টস*কে নির্ভুলভাবে বিস্তারিত আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে তিনি সার্বিক সহায়তা দান করে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে ধ্যান শ্যাম শর্মা ও ভিশাল রাস্তোগী'র নিরলস চেষ্টা আর নিবেদন ছাড়া এটা কখনোই বইয়ের রূপ ধারণ করতে পারতো না। নারায়ণ মূর্তি ও ভি. পোনরাজের দেওয়া তথ্য-উপাত্তকে মূল্যায়ন করি। আমার সাথে নিরলসভাবে আমার পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা এবং সুসম্পাদনায় বইটি প্রকাশ করার জন্য আমি প্রকাশকের কাছে ঋণী। আমার পাণ্ডুলিপি স্বল্পসময়ের মধ্যে টাইপ করে মুদ্রণের উদ্দেশ্যে প্রেসে পাঠানোর জন্য আমি আরো ধন্যবাদ দেই রাজিন্দর গানজুকে।

অনুবাদকের কথা

“বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ কর মহোজ্জ্বল আজ হে
বরপুত্রসংঘ বিরাজ হে।
ঘন তিমিররাত্রির চিরপ্রতীক্ষা পূর্ণ কর, লহ জ্যোতিদীক্ষা।
যাত্রিদল সব সাজ হে। দিব্যবীণা বাজ হে।
এস কর্মী এস জ্ঞানী, এস জনকল্যাণধ্যানী,
এস তাপসরাজ হে!
এস হে ধীশক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।।”
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবরে জন্ম নেওয়া শিশুটি দিনে দিনে বড় হয়ে ওঠে এক বিশাল কর্মযজ্ঞে নিজেকে সঁপে দেন। এই কর্মযজ্ঞের সাগ্নিক পুরুষটির নাম এ. পি. জে. আবদুল কালাম। তিনি তাঁর মেধা, মনন, চিন্তাচেতনা, অধ্যবসায়, উদ্দীপনা, অভিজ্ঞতা, সততা আর চরিত্রের দৃঢ়তার বলে সাফল্যের উচ্চশিখরে আরোহন করতে সমর্থ হন। তাঁকে আমরা দেখতে পাই একজন রাষ্ট্রপ্রধান, একজন বিজ্ঞানী, একজন শিক্ষক, একজন কবি, একজন পরিব্রাজক, একজন উন্নয়নের রূপকার এবং সর্বপরি একজন সৎ মানুষ হিসাবে। তিনি তাঁর বালক বয়সে পিতার কাছ থেকে সততার যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর জীবনে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। সততার দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে লোভলালসাহীন অনাড়ম্বর জীবনযাপনে ব্রতী থাকার অসংখ্য কথা উঠে এসেছে তাঁর আত্মকথন থেকে।

ড. এ. পি. জে. আবদুল কালাম তাঁর “টার্নিং পয়েন্টস” গ্রন্থের চৌদ্দটি অধ্যায়ে আত্মকথনের মাধ্যমে নিঃসঙ্কোচে ও সাহসিকতার সাথে তাঁর কর্মজীবনের নানা ঘটনাকে তুলে ধরেছেন। তিনি প্রথমে সিনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিসট্যান্ট হিসাবে চাকুরীতে ঢুকে ধাপে ধাপে উচ্চতম পদে আসীন হন। পরিশেষে ভারতের রাষ্ট্রপতির পদ লাভ করেন ।

তাঁর চাকরি জীবনে তিনি ভারতের রোহিনী উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য প্রথম স্যাটেলাইট লঞ্চ ভাইকল, এসএলভি-৩, উন্নয়নের জন্য প্রধান ভূমিকা রাখেন। তিনি

ভারতের মিসাইল সিস্টেম ও নিউক্লিয়ার টেস্টগুলোর প্রধান উদ্গাতা হিসাবে বিশেষভাবে খ্যাত। তিনি টেকনোলজি ভিশন ২০২০-এর রোডম্যাপ প্রদান করে ভারতকে উন্নত জাতিতে পরিণত করতে ব্রতী আছেন।

ভারতের একাদশতম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি দেশে-বিদেশে বহুবিধ কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ২০২০-এ ভারতকে উন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নিত করার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, যোগাযোগ, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল অননুকরণীয়। ভারতের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে তরুণ-তরুণী, শিশু ও নারীদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য তাঁর নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার কথা অনুপম অনুষঙ্গে এই গ্রন্থে তিনি তুলে ধরেছেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তাঁর হৃদয়ের উদার মানবিকতা, ধীসম্পন্ন সরলতা ও সততার নজির পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। ইংরেজি ভাষায় তাঁর লেখা *টার্নিং পয়েন্টস* বইখানাকে বঙ্গানুবাদ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি। তাঁর প্রতি রইল সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে, আমাকে এই বইখানা অনুবাদ করার দায়িত্ব দেওয়ায় অন্যধারার স্বত্বাধিকারী মোঃ মনির হোসেন পিন্টুকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বঙ্গানুবাদের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করায় স্নেহের মলয় ও সঞ্চিতাকে শুভেচ্ছা জানাই। ভ্রাতৃপ্রতিম অঞ্জন ও সত্যরঞ্জন অন্যান্যভাবে সহায়তা করায় তাদের প্রতি রইলো কৃতজ্ঞতা। ভুলভ্রান্তি থাকলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা রাখি। পাঠকের বইখানা ভালো লাগলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

২৫ ডিসেম্বর ২০১২

মনোজিৎকুমার দাস

সূচিপত্র

১। কখন আমি ভারতের গান গাইতে পারি?/১৩
২। আন্না ইউনিভার্সিটিতে আমার নবম বক্তৃতা/১৯
৩। আমার জীবনের সাত সন্ধিক্ষণ/২৫
৪। পারস্পরিক সহমর্মিতায় রাষ্ট্রপতি/৩৫
৫। আমি জাতিকে কী দিতে পারি?/৪৭
৬। অন্যান্যদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ/৫৬
৭। একটা প্রতিযোগিতামূলক জাতির প্রতি/৬৮
৮। মোমবাতি ও মথ/৭৭
৯। আমার গুজরাট সফর/৮১
১০। দেশে-বিদেশে/৮৫
১১। পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত ভারতের হৃদয়/৯৫
১২। উদ্যানে/১০১
১৩। বিতর্কমূলক সিদ্ধান্তসমূহ/১০৬
১৪। রাষ্ট্রপতিত্বের পর/১১৩
উপসংহার/১২১
অতঃপর/১২৭
পরিশিষ্ট-১/১২৯
পরিশিষ্ট-২/১৪১

১

কখন আমি ভারতের গান গাইতে পারি?

প্রকৃতিকে সুন্দর রেখে তার আশীর্বাদ পেতে যত্নবান হও
তাহলেই সব কিছুর মধ্যে পবিত্রতা খুঁজে পাবে।

আমার রাষ্ট্রপতি পদের শেষ দিনটা ছিল ২০০৭ এর ২৪ জুলাই। দিনটি নানা আয়োজনে ঠাসা। সকালবেলা আমি আমার ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত ছিলাম। দিনের শেষ দিকে ৩.২৫ টা থেকে **সিএনএন-আইবিএন** এর রাজদীপ সারদেশাই ও দিলীপ ভেঙ্কটারমন এর সাথে একটা সাক্ষাৎকার ছিল। তারপরই চন্ডিগড়ের গভর্নর ইএসএল নরসীমহান এর সাথে এবং উত্তরাখন্ডের হেল্থ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এন্ড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি মিনিস্টার ড. রমেশ পোখারিয়াল 'নিশাঙ্ক'-এর সাথে মিলিত হই। বিকাল ৪টায় দিল্লি কলেজের ছাত্রী মিস চারিসমা থাঙ্কাপপ্পান আমার সাথে সাক্ষাত করেন। তার সাথে তার বাবা-মাসহ আরো পাঁচজন ছিলেন। তারপর আমি মিলিত হই বিদেশ মন্ত্রণালয়ের প্রটোকল প্রধান সুনীল লাল ও তার স্ত্রী গীতাঞ্জলী ও মেয়ে নিতিকার এর সাথে। রাত ৮টা পর্যন্ত বেশ কয়েকটা বিদায় সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান হলো। আমি নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সম্মানে একটা ডিনারের আয়োজন করলাম।

আমার ফেয়ারওয়েলে এবং সাক্ষাতে মিলিত হওয়া লোকজন আমার সামান্য জিনিসপত্রে ভরা দুটো সুটকেস দেখতে পেল। সত্যিকথা বলতে আমি তাদেরকে বললাম আমি শুধুমাত্র ওইগুলোই সাথে নিয়ে যাচ্ছি। ফলে সবার মনে এক ধরনের নেতিবাচক ভাবনার উদয় হলো। যারাই আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন কিংবা আমার সাথে কথা বলেছিলেন তারাই তাদের মনে জাগা

প্রশ্নটা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তাদের মুখে একই প্রশ্ন! আমি আগামীতে কী করে সময় কাটাবো? আমি কি বাইরে কোন কাজে যুক্ত থাকবো? নাকি আমি আবার শিক্ষকতার পেশায় ফিরে যাব, নাকি আমি সক্রিয় জীবন থেকে সম্পূর্ণ অবসর নেব। আমাকে যারা চেনেন তারা শেষ প্রশ্নের উত্তরটা জানেন। রাষ্ট্রপতিভবনে গত পাঁচটা বছরে আমার মনটা তরতাজা ছিল। মোঘল গার্ডেনের প্রস্ফুটিত পুষ্পের হাসি, ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খানের শেষ অনুষ্ঠান আর অন্যান্য সঙ্গীতজ্ঞের সুর মূর্ছনা, ভেষজ উদ্যানের সুরভি, ময়ূরের নাচানাচি আর গ্রীষ্মের দাবদাহ এবং শীতের কনকনে ঠাণ্ডার মাঝে দণ্ডায়মান প্রহরীরা ছিল আমার দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমি গত পাঁচ বছরে এক অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম।

সর্বস্তরের লোকজন জাতির উন্নতির জন্য তাদের অভিজ্ঞতা আমাকে জানিয়েছিলেন। রাজনীতিবিদরা প্রতিক্ষেত্রেই তাদের ধ্যানধারণা আর উচ্চাশা আমার সমীপে উপস্থাপন করেছিলেন। বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর সমাধান করার আকাঙ্খা আমার কাছে ব্যক্ত করেন। শিল্পী ও লেখকরাও আন্তরিকভাবে ভারতের জন্য অনুরাগ প্রকাশ করেন।। ধর্মগুরুরা খোলামনে একই মঞ্চে আধ্যাত্মিক সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে তাদের চিন্তাভাবনা আমার কাছে তুলে ধরেছিলেন। সকল নাগরিকের প্রতি সমান আর সুন্দর আচরণ সম্পর্কীয় সাম্প্রতিককালের ইস্যুগুলো সম্বন্ধে আইনজীবী সম্প্রদায় তাদের যথাযথ ধ্যান-ধারণা পেশ করেছিলেন। অনাবাসী ভারতীয়দের সাথে আমার যখন যেখানেই সাক্ষাৎ হয়েছে তারা তাদের জন্মভূমিতে ফিরে এসে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন। দেশের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণকালে আমি চমৎকার চমৎকার সব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। সেই সব অভিজ্ঞতা থেকে আমি জনগণের আশাআকাঙ্খার প্রতিফলন লক্ষ্য করেছি। অনেককেই ভালো ভালো কাজ করতে দেখেছি। বিশেষ করে যুবকদের কাছ থেকে শক্তির পরিচয় পেয়েছি।

চিকিৎসকদের সাথে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করে জেনেছি গ্রামীণ নাগরিকদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তাদের নিরলসভাবে কাজ করে যাবার কথা। গবেষণা কাজে উৎসাহ দান, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্য লোকজনদের যোগ্য কাজের ব্যবস্থা করা, সিনিয়র সিটিজেনদের কাছে জীবনযাপনের ধারা

পরিবর্তনের বার্তা পৌছে দিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়েছি। ভারত এবং ভারতের বাইরে থাকা যে সমস্ত নার্সরা আমার সাথে দেখা করেছিলেন তারা তাদের গুণগতমান বৃদ্ধির কথা জানিয়েছিলেন। তারা গ্রামের জনগণের সেবায় নিবেদিত সেকথাও আমাকে বলেছিলেন।

দুঃস্থ তুলাচাষি সহ সকল কৃষকের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল। আমি তাদের সমস্যাবলি বুঝতে সক্ষম হই। তারা যে সমস্ত সমস্যাবলির মুখোমুখি তার সমাধানের জন্য কৃষি বিশেষজ্ঞদের কাছে আমি আমার ধ্যানধারণা জ্ঞাপন করি। আমি পোস্টম্যানদের সাথেও মতবিনিময় করি। তারা গ্রামীণ জনগণের ডাক সেবাদানে ব্রতী থাকায় শিক্ষিত সমাজে পোস্টাল সেবাদানে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন।

পুলিশম্যানরাও আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। পুলিশ বিভাগের সংস্কার, পুলিশ স্টেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ধ্যানধারণা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ বিভাগের সংস্কারের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট ফোরামে আমার মতামত উপস্থাপন করি।

পঞ্চায়েত প্রধান বিশেষ করে মহিলা প্রধানরা তাদের গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি ব্যক্ত করেন। সেইসাথে তারা যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন তাও আমাকে জানান।

আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানেই শিক্ষকরা আমাকে নিশ্চয়তা দান করেছেন যে জাতি গঠনের জন্য তরুণ সমাজকে বিকশিত করা তাদের ব্রত। তারা আমাকে বলেন যে তারা তরুণদের মাঝে এমন মূল্যবোধের বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছেন যাতে তারা আলোকিত মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বাচ্চাকাচ্চা, পিতামাতা, শিক্ষক, চাকরিজীবী, প্রশাসকগণ, আইনজীবী, চিকিৎসক, সেবিকারা সহ অন্যান্যদের কাছ থেকে যে শপথ উচ্চারিত হয় তার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি আলোকিত হই। শপথগুলো লোকজনের বিভিন্ন গ্রুপের সাথে আলাপ-আলোচনা থেকে গৃহীত হয়। সাধারণত শপথগুলো পাঁচ, সাত, কিংবা দশটা মতামতেরই সমষ্টি। সমবেত জনতার শপথের মধ্যে সর্বসম্মত উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। আর এই শপথগুলোর মধ্যে তাদের জীবনযাপনের একটা বার্তা অবশ্য ছিল।

অবাক না হয়ে পারার মতো একটা অনুষঙ্গ ছিল। আমি রাষ্ট্রপতি থাকাকালে অগণিত চিঠিপত্র, ই-মেল আমার কাছে এসেছিল। চিঠিপত্রগুলো এসেছিল শিশু কিশোর, যুবক, বয়স্কদের কাছ থেকে। শিক্ষক এবং বিজ্ঞানীরাও আমাকে অনেক অনেক চিঠি লিখেছিলেন। অবিশ্বাস্য হলেও প্রতিদিন হাজার হাজার চিঠি আসতো। সমস্ত চিঠির প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না। তবুও আমরা জবাব দেবার চেষ্টা করি। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই চিঠিগুলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসা সংক্রান্ত চিঠির ক্ষেত্রে উপযুক্ত হাসপাতালে ভর্তি হবার পরামর্শ দেবার চেষ্টা করেছিলাম। কোন কোন সময়ে পত্র প্রেরকদেরকে আমরাই প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ দান করেছিলাম। আবার কোন কোন সময় যৎসামান্য আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হয়েছিল। পত্রগুলো আমাদের দেশবাসী কতটা আশা, ভরসা আর বিশ্বাস নিয়ে লিখেছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তাদের পত্রগুলোর মধ্যে দু:খ, কষ্ট, ব্যথা বেদনা আর লক্ষ্য অর্জনের অনুরণন ছিল। দুঃস্থ অবস্থার মাঝে নিপতিত একটা পরিবারের এক যুবতী মেয়ের কাছ থেকে আসা একটা চিঠি আমার হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তার হৃদয়স্পর্শী পত্র আমার অন্তরাত্মাকে আলোড়িত করায় তার জীবনটাকে সুন্দর করতে সমর্থ হয়েছিলাম। আমরা তার পত্রটাকে এমন একজনের কাছে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম যাতে ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে মেয়েটির পরিবার আলোর মুখ দেখতে পারে।

'আমার পরিবার কষ্টের মাঝে দিনাতিপাত করছে। ২৩ বছর যাবত আমার পরিবার নানাবিধ সমস্যার মধ্যে কালাতিপাত করছে। একটা দিনের জন্যেও আমি এবং আমার পরিবার কখনো সুখের মুখ দেখেনি। আমি পড়াশোনায় ভালো। আমি আমাদের কেন্দ্রে পঞ্চম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিলাম। আমি একজন ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি পরে আর কখনোই প্রথম হতে পারি নি। তারপর থেকে আমি সব ক্লাসেই দ্বিতীয় না হয় তৃতীয় হয়েছি। বি.এ. তে আমি মাত্র শতকরা ৫০ নম্বর পেয়েছিলাম। অভাব অনটনের জন্য আমার ডাক্তারী পড়া হয়ে উঠে নি। আমি চৌদ্দটা বছর অভাব অনটনের মধ্যে আছি...'

এ ধরনের বহু চিঠিপত্র এসেছিল। রাষ্ট্রপতিভবন থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে এই বিশ্বাস আর ভরসায় এইসব মর্মস্পর্শী চিঠিপত্র তারা আমাকে লিখেছিল।

বিভিন্ন সমিতি আর সংস্থা থেকে আসা চিঠিপত্রে আস্থার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল। 'প্রিয় রাষ্ট্রপতি কালাম, আমরা অ্যাডভান্স ন্যানোটেক্‌নোলজির উপর একটা কন্‌ফারেন্সের আয়োজন করতে যাচ্ছি, (কিংবা অন্যকোন বিশেষায়িত বিষয়, যেমন বায়োডাইভার্সিটি, কার্বন কমপোজিটস, রকেট প্রোপালশন টেকনোলজি, কারডিওথোরাসিক সার্জারি, ইফেক্‌টিয়াস ডিজিজেজ, স্ট্যার্টজি ফর রিডিউসিং পেনডেন্সি অব কোর্ট কেসেস, কিংবা ই-গভর্ন্যান্স...), আমরা এই কনফারেন্সের মূলবিষয়াদির উপর বক্তৃতা দেবার জন্য আপনাকে পাবার বাসনা করেছি।' এই কোর্সগুলোর উপর কথা বলা আমার পক্ষে সহজতর হলেও কনফারেন্সের দিনতারিখ, বিষয় এবং আমার জ্ঞানের উপরই বিষয়টা নির্ভর করে। ইন্ডিয়া ২০২০ জন্য তরুণী মেয়েটির দেখভাল করে জীবনকে সুচারু করা এবং কনফারেন্সে টেকনোলজির বিকাশ সম্বন্ধে ভাষণ দেওয়া আমার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

এইসব চিন্তাভাবনা থেকেই আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম পরবর্তীকালে আমার কী করা উচিত। আমাকে কী নীরব হয়ে যাওয়া উচিত না নাকি আমার কিছু একটা করা উচিত? কী করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার পক্ষে সহজ নয়। আমি একটা আশার আলো দেখলাম। জাতির উদ্দেশ্যে আমার বিদায় ভাষণে আমার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করার জন্য একটা সুন্দর ভাষণ প্রস্তুত করার কথা আমি ভাবলাম।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি আমার বিদায় ভাষণে দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানাবো এবং ভারতের উন্নয়নের জন্য তাদেরকে অংশ নিতে অনুরোধ করবো, যে কথা আমি আমার পাঁচ বছর মেয়াদকালে তাদেরকে অনেক অনেকবার বলেছি।

বিদায় ভাষণে আমি তাদেরকে বললাম, 'আমার প্রিয় দেশবাসী, আসুন আমরা একটা দেশের মিশনকে সফল করতে কাজ চালিয়ে যাই যাতে সমৃদ্ধি, স্বাস্থ সেবা, নিরাপত্তা, সুখ ও শান্তির ধারা টেকসইভাবে প্রগতির পথে চালিত হয় গ্রাম আর পৌর এলাকার মাঝে বিভাজন কমে আসে। সরকার যেন দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ ও দুর্নীতি মুক্ত হয়। আমি আমার বইয়ে বারবার উল্লেখ করেছি ভারতের উন্নয়নের জন্য দশ দফা প্রোফাইলের বাস্তবায়ন ঘটানোর কথা।

আমার জীবনের ব্রত আমাদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ভারতের লাখো কোটি মানুষের হৃদয়মনের সাথে একাত্ম হয়ে 'আমরাও সফল হতে পারি'

এই আত্মবিশ্বাসকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে উন্নয়নের দশ দফার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা। আমি সদাসর্বদা অবশ্যই আপনাদের সাথে থাকবো, আমার প্রিয় দেশবাসী, ২০২০ এ ভারতকে একটা উন্নত রাষ্ট্রে পৌঁছে দেবার মিশনে আমি আপনাদের সাথেই থাকবো।

বেশ কয়েকটা ঘটনায় আমার দিগন্ত আলোকিত, তা থেকেই আমার ওষ্ঠে হাসির রেখা, এ থেকেই আমি আমার দেশবাসীকে ভালোবাসতে শিখেছি।

২

আন্না ইউনিভার্সিটিতে আমার নবম বক্তৃতা

তরুণদের প্রজ্জ্বলিত মন
সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পদ
বিশ্ব জমিনে, বিশ্ব মহাকাশে
আর বিশ্ব তলে।

জামুন গাছে বসা হলুদ পাখিটির গান আমার প্রাত:ভ্রমণকে আনন্দদায়ক করে তুললো। আমি আমার উদ্যানে মাঝে মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় হর্নবিল পাখির ওড়াউড়ি দেখার চেষ্টা করে থাকি। রাষ্ট্রপতিভবনের পর দশ নম্বর রাজাজী মার্গে আমার আবাসস্থল। আমাকে জানানো হয়েছিল, এক সময় ওই বাড়িটাতে নতুন দিল্লির স্থপতি এডুইন লুটিয়েনস বসবাস করতেন। সময় বহে যায় বাতাসের মতো। আমি ভারত ও বিদেশে শিক্ষাদান আর গবেষণা কর্মে নিয়োজিত থাকি। ক্লাসরুমে উৎসাহী আর উদ্দীপ্ত তরুণ-তরুণীদেরকে পেয়ে আমিও শক্তি সঞ্চয় করি।

লোকজন ভারতের উন্নয়নের মিশনকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এই আশায় শেষ পাঁচ বছর আমি অসীম আশায় বুক বেঁধে ছিলাম। আমি আশায় ছিলাম যে তারা তাদের করণীয় কাজ করার কথা আমাকে জানাবে। রাষ্ট্রপতি থাকাকালের অনেক ঘটনা আমার মানসপটে ভাস্বর হয়ে আছে। সেই ঘটনাগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্যময় এই দেশের নানা বৈচিত্র্যেরই প্রতিফলন অবশ্যই ছিল। বিষয়গুলো গৌরবান্বিত অতীত ও চ্যালেঞ্জিং বর্তমানের মেলবন্ধনে ভাস্বর ছিল। একটা বার্তা কিন্তু বিষয়গুলোর মধ্যে প্রতিভাত হয়েছিলঃ ২০২০ সালে ভারত উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে পৌছাবে।

≈

২০০২ সালের ১০ জুনের সকালে আন্না ইউনিভার্সিটির পরিবেশ অন্যান্য দিনের সকালের মতোই সুন্দর ছিল। আমি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০১ এর জুন মাস পর্যন্ত কাজ করেছিলাম। শান্ত স্নিগ্ধ বিশাল ক্যাম্পাসে প্রফেসর এবং অনুসন্ধিৎসু ছাত্রছাত্রীদের সাথে সম্পৃক্ত থেকে শিক্ষকতা ও গবেষণার কাজ করে আমার সময় আনন্দের সাথে কেটেছিল। কর্তৃপক্ষ আমার ক্লাসের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নির্ধারিত করে দিয়েছিল ষাট জন। আমার প্রত্যেকটা লেকচারে ক্লাসরুমে ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রীরও বেশি উপস্থিত থাকতো। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার উপায় ছিল না। তরুণ-তরুণীদের আশা-আকাঙ্খাকে হৃদয়াঙ্গম করা ও আমার ন্যাশনাল মিশনগুলো থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে তাদের সঙ্গে শেয়ার করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। পোস্ট গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে দেওয়া আমার দশটা লেকচারের তথ্যাদি তাদের কাছে প্রকাশ করার ইচ্ছাও আমার ছিল।

ন্যাশনাল মিশনের দ্বারা আমি কি অর্থ করেছিলাম? আমি স্পেস লঞ্চ ভিইকল, এসএলভি-৩, আইজিএমডিপি (ইন্ট্রাগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম), দ্য ১৯৯৮ নিউক্লিয়ার টেস্টস, এবং দ্য ইন্ডিয়া ২০২০ রিপোর্ট প্রিপিয়ার্ড বাই টিএফএসি (টেকনোলজি ইনফরমেশন, ফোরকাস্টটিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট কাউন্সিল)। এগুলো ছিল জাতির উন্নয়নের পরিমাপযোগ্য মাপকাঠি। ৪০ কেজি ওজনের রোহিনী নামের দেশীয় উপগ্রহটিকে পৃথিবীর কাছাকাছি কক্ষপথে প্রেরণই এসএলভি-৩ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল। উপগ্রহটির সাহায্যে আইনোস্ফেরিক পরিমাপ করা সম্ভব হবে। আইজিএমডিপি এর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধকৌশলগত মাল্টিপ্লিয়ার মিশাইল সিস্টেম গড়ে তোলা। অগ্নি ভি মিশাইল হচ্ছে আইজিএমডিপি এর সর্বশেষ সফলতা। ১১ এবং ১৩ মে ১৯৯৮ তারিখে এর নিউক্লিয়ার টেস্ট করা হয়। ফলশ্রুতিতে ভারত একটা নিউক্লিয়ার রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। টিআইএফএসি হচ্ছে ভারতকে ২০২০ সালের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার রোড ম্যাপ।

আমার নবম লেকচারটির টাইটেল ছিল 'ভিশন টু মিশন', কয়েকটি কেস স্টাডিও এই লেকচারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমার বক্তৃতা শেষ করার পর আমাকে অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। আমার ক্লাসের সময় এক ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে দু'ঘন্টা করা হয়। বক্তৃতা দেবার পর আমি আমার অফিসে ফিরে আসি। অন্য

আর একদিন একদল রিচার্স স্টুডেন্ট আমার ওখানে লাঞ্চ করেন। রাঁধুনি প্রাসাংগাম হাসি মুখে আমাদেরকে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করে। লাঞ্চের পরে আমি পরবর্তী ক্লাসের জন্য প্রস্তুতি নিলাম। সন্ধ্যার দিকে আমি আমার রুমে ফিরে এলাম।

ফিরে আসা মাত্রই আন্না ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর এ.কল্যানিধি আমার সাথে মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন যে দিনের বেলা তার অফিস আমার সাথে কথা বলার জন্য অনেক টেলিফোন কল করেছেন। তিনি চলে যাবার পর আমি আমার রুমে ফিরে গেলাম। আমি টেলিফোন বাজতে শুনলাম। রিসিভার কানে লাগাতেই অপর প্রান্ত থেকে একটা কণ্ঠ আমাকে বললেন, 'প্রধানমন্ত্রী আপনার সাথে কথা বলতে চান।' প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছি এমন সময় অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু আমার সেল ফোনে কল করলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'অল্প সময়ের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা টেলিফোন পাবেন। আপনি অনুগ্রহ করে নেতি বাচক জবাব দেবেন না।'

যখন আমি নাইডুর সাথে কথা বলছিলাম তখনই প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর টেলিফোন কল পেলাম। প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'কালাম, আপনার একাডেমিক জীবন কেমন চলছে?'

'চমৎকার,' আমি জবাবে বললাম।

বাজপেয়ী বলে চললেন, 'আপনার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে। আমি এইমাত্র সমস্ত কোয়ালিশন পার্টির নেতাদের এক বিশেষ সভা থেকে আসছি। আমরা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে জাতি চায় আপনি রাষ্ট্রপতি হোন। আজ রাতে এ বিষয়ে ঘোষণা দিতে যাচ্ছি। আমি আপনার সম্মতি পেতে চাই। আমি প্রত্যাশা করি আপনি এ বিষয়ে 'হ্যাঁ' বলবেন, অবশ্যই 'না' বলবেন না। বাজপেয়ীর নেতৃত্বে প্রায় দু'ডজন পার্টির সমন্বয়ে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক এ্যালায়েন্স (এনডিএ) গঠিত। সবসময় তাদের মধ্যে মতের অমিল হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

রুমে ঢুকে বসবার মতো সময় হাতে পেলাম না। ভবিষ্যতের নানা ভাবনা আমার সামনে হাজির হলো। সব সময়ই আমাকে ঘিরে ছাত্র ও শিক্ষকরা থাকলেও পার্লামেন্টে জাতির উদ্দেশ্যে একটা ভিশন পেশ করার ইচ্ছে আমার আছে। বেশ দিন থেকেই আমার মনের মধ্যে একটা উন্নয়নের রূপরেখা ঘুরপাক

খাচ্ছিল। আমি বললাম, 'বাজপেয়িজী (আমি তাকে সাধারণত এই বলেই সম্বোধন করতাম।) আমাকে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কি দুই ঘন্টা সময় দিতে পারবেন? রাষ্ট্রপতি পদে আমাকে মনোনয়ন দিতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সকলেই একমত আছে কিনা সেটাও আমার জানা প্রয়োজন।'

বাজপেয়ী বললেন, 'আপনি রাজি থাকার পরই আমরা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবো।' পরবর্তী দু'ঘন্টা আমি আমার ঘনিষ্ঠবন্ধুদের কাছে তিরিশটি টেলিফোন কল করলাম। তাদের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লোকজন, সিভিল সার্ভিসের বন্ধুরা এবং রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টরাও ছিলেন। একটা মত এলো যে আমি শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডেরর সঙ্গে লিপ্ত। আমি ওই কাজের প্রতি নিবেদিত ও অনুরক্তও বটে। ওই কর্মকান্ড থেকে সরে আসা আমার উচিত নয়। দ্বিতীয় মতামতটা ছিল জাতি ও পার্লামেন্টের সামনে ভারতকে ২০২০ সালের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার জন্য আমার চিন্তা চেতনাকে তুলে ধরার এটাই অপূর্ব সুযোগ। ঠিক ঠিক দু'ঘন্টা পরে আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে তাকে বললাম, 'বাজপেয়িজী, খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ মিশনের জন্য আমি এটা গ্রহণ করছি। তবে সমস্ত দলের প্রার্থী হিসাবে পদটি গ্রহণ করাটাই আমি বেশি পছন্দ করি।'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা এজন্য অবশ্যই কাজ করবো, আপনাকে ধন্যবাদ।'

অবশ্যই খবরটা দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়লো। আমি রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হতে রাজি আছি এই খবরটা পনেরো মিনিটের মধ্যে সারাদেশে জানাজানি হয়ে গেল। তাৎক্ষণিকভাবে আমার কাছে অসংখ্য টেলিফোন আসতে শুরু করলো। আমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হলো। আমার রুমে অনেক ভিজিটরও উপস্থিত হলেন।

ওই দিনই রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী পছন্দের বিষয়ে বাজপেয়ী বিরোধী দলের নেতা সোনিয়া গান্ধীর সাথে পরামর্শ করলেন। মিসেস গান্ধী জিজ্ঞেস করলেন এনডিএ এর পছন্দ চূড়ান্ত কিনা। প্রধানমন্ত্রী তার প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দিলেন। তার দলের সদস্য ও কোয়ালিশনের শরিকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে ১৭ জুন ২০০২ তারিখে আমাকে প্রার্থী হিসাবে মিসেস গান্ধী ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (আইএনসি) সমর্থন ঘোষণা করলেন। আমি বাম দলগুলোরও সমর্থন প্রত্যাশা করছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের প্রার্থী দিল। আমি রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হবার সিদ্ধান্ত নেওয়া মাত্র অসংখ্য পত্র আমার কাছে

আসতে শুরু করলো। মিডিয়াতে অনেক কথা উঠলো। তারা জিজ্ঞেস করলো, কিভাবে একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি বিশেষ করে একজন বিজ্ঞানী জাতির রাষ্ট্রপতি হন?

≈

রাষ্ট্রপতির প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দেবার পর ১৮ জুন ছিল আমার প্রেস কনফারেন্স। সাংবাদিকরা আমাকে গুজরাট ইস্যু,(রাষ্ট্রটির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিভাবে মোকাবিলা করা বিষয়ক) অযোধ্যা ইস্যু, (রাম জন্মভূমি ইস্যু যা সর্বদাই খবরের বিষয় ছিল।), নিউক্লিয়ার টেস্ট ও রাষ্ট্রপতিভবনে আমার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাকে অনেক প্রশ্ন করা হলো। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, সঠিক আর যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভারতের প্রয়োজন শিক্ষিত রাজনৈতিক শ্রেণির। অযোধ্যা ইস্যু সম্পর্কে আমি বললাম, এখন প্রয়োজন শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পাবে। আমি রাষ্ট্রপতিভবনের জাকজমক হ্রাস করে সহজ সরল অনুষঙ্গের আবহ সৃষ্টি করবো বলে তাদের কাছে কথা দিলাম। কোন সমস্যার উদ্ভব ঘটলে রাষ্ট্রপতি হিসাবে আমি দেশের প্রধান প্রধান সংসদীয় বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করবো। ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির শাসন সম্পর্কে কতিপয় লোকের মতামতকে প্রাধান্য না দিয়ে জনগণ কী চায় তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে।

আমি ১০ জুলাই চেন্নাই থেকে এশিয়াড ভিলেজে আমার ফ্লাটে ফেরার সময় আমার ইলেকশন ক্যাম্পেনের পুরোদস্তুর প্রস্তুতি চলছিল। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রমোদ মহাজন আমার ইলেকশন এজেন্ট হলেন। আমি আমার ফ্লাটে একটি ক্যাম্প স্থাপন করলাম। ওটা বড় ধরনের ফ্লাট না হলেও ওখানে কিছুটা সুযোগ সুবিধা ছিল। আমি আমার ফ্লাটে একটা ভিজিটরস রুম বানালাম। কনফারেন্স হলকে সাজানো হলো। পরে একটা ইলেট্রোনিক ক্যাম্পও স্থাপন করা হয়। সমস্ত তথ্যাদি ইলেকট্রোনিক যন্ত্রপাতিতে রাখা হতে লাগলো। রাষ্ট্রপতি হিসাবে আমার ভিশন জ্ঞাপনপূর্বক ভোট প্রার্থনা করে লোকসভা এবং রাজ্যসভার প্রায় ৮০০ সদস্যের কাছে পাঠানোর জন্য একটা পত্রের ড্রাফ্‌ট তৈরি করা হলো।

মহাজনের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যের ইলেকটোরাল কলেজের মেম্বারদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে মিলিত না হয়ে আমি তাদের কাছে পত্রগুলো প্রেরণ করলাম। ফলশ্রুতিতে ১৮ জুলাই অনেক ব্যবধানে বিজিত হিসাবে আমাকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করা হলো।

সারাদিন আমি বহু সংখ্যক দর্শনার্থী ও মিডিয়া কর্মীর সাথে মিলিত হলাম। শিশুদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের বিভিন্ন ইস্যু সম্পর্কে আমি জ্ঞাত হলাম। এশিয়াড ভিলেজের ফ্লাট নম্বর ৮৩৩ মানুষের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠলো। ২৫ জুলাই এর শপথ অনুষ্ঠানে গেস্টদের তালিকা তৈরি করা হলো। পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে আসন সংখ্যা মাত্র ১০০০। এছাড়া দুই হাউসের অফিসকর্মী, হোম ও অন্যান্য মিনিস্ট্রির আমলা ও বিদায়ী রাষ্ট্রপতি কে. আর নারায়ণ-এর অতিথির জন্য মাত্র ১০০ আসন ছিল। সেই আসনকে আমরা ১৫০ এর মতো সংখ্যাতে উন্নিত করলাম। ১৫০ টি আসনেও তাদের স্থান সংকুলানের সমস্যা হলো। পারিবারিক গেস্টদের সংখ্যা সাইত্রিশ। আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ফিজিকস টিচার প্রফেসর চিন্নাদুরাই উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাজ ইন্‌স্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির প্রফেসর কে. ভি. পানদালাই ও পকশী ভেন্‌কাটাসুব্রাহ্মনিয়াম, রামেশ্বরম মসজিদের ইমাম নুরুল খুদা, রামেশ্বরম চার্চের যাজক রেভ. এ. জি. লিওনার্ড, অরবিন্দ আই ইন্‌স্টিটিউট এর বিখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. জি. ভেনকাটাস্বামী। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ড্যান্সার সোনাল মানসিংহ। এছাড়াও শিল্পপতি, সাংবাদিক, ব্যক্তিগত বন্ধুরাও ছিলেন। অতিথিদের তালিকায় দেশের সমস্ত রাজ্য থেকে ১০০ জন শিশুও ছিল। তাদেরকে পৃথকভাবে বসবার ব্যবস্থা করা হলো। তাদেরকে সিনিয়র এডিসিদের তত্ত্বাবধানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। দিনটা গরমের হলেও প্রত্যেকেই আনুষ্ঠানিক পোশাকে ঐতিহাসিক সেন্ট্রাল হলের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আমার দেশের সহজ সরল লোকজনের বিজ্ঞতায় ভরা সরলতা সর্বদাই আমাকে দৃঢ় বিশ্বাস দান করে, যা থেকে আমার দেশ শান্তি আর সমৃদ্ধিতে সেরা হবে।

৩

আমার জীবনের সাত সন্ধিক্ষণ

তুমি নানা সমস্যার শিরোমণি
সমস্যাগুলোকে হটিয়ে সফল হও।

আমি শেখাতে আর গবেষণা করতে ভালোবাসি। আমি কখনো বারবার কথা বলে ক্লান্ত হই না। আমার একাডেমিক জীবন চিন্তাচেতনা আর সৃজনশীলতায় ভরপুর। তরুণ-তরুণী ও তাদের শিক্ষকদের সাথে আমার পারস্পরিক সম্পৃক্ততাই আমার নিজের অন্তরের খাদ্য। আমি সচেতনভাবে শিক্ষাঙ্গনে এবং গবেষণার ক্ষেত্রে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

আমি সবেমাত্র বর্ণনা করেছি হঠাৎ করে দেশের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করার ইতিবৃত্ত। যদিও আমি তখন পূর্ণমাত্রায় একাডেমিক ক্যারিয়ার গড়ে তোলবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলাম। রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণের ঘটনা ছাড়া আরো ছয়টা ঘটনা যা আমার স্মৃতিতে সর্বদা জাগরুক থাকে। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব শেষ হবার পর ভারত আর বিদেশের একাডেমিক লাইফের সাথে যুক্ত হবার সুযোগ আবার আমি পেলাম।

≈

১৯৬১ ছিল আমার জীবনের প্রথম সন্ধিক্ষণ। এয়ারনটিক্যাল ডেভেলপ্মেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট (এডিই) এ একজন সিনিয়র সায়েন্টিফিক এ্যাসিটেন্ট হিসাবে কাজ করার কথা এখনো স্মরণে আছে। আমি একটা হোভারক্রাফ্‌ট এর চিফ ডিজাইনার ছিলাম। হোভারক্রাফ্‌টটির নাম দেওয়া হয়েছিল নন্দী। হোভারক্রাফ্‌ট রেডি হলে আমরা উড্ডয়ন সম্পর্কে ভিজিটরদেরকে ধারনা দিতাম। একদিন (এডিই) এর ডিরেক্টর ড. গোপীনাথ মেডিরাত্তা শ্মশ্রুমণ্ডিত দীর্ঘকায় সুদর্শন

একজন ভিজিটরকে নিয়ে এলেন। তিনি আমাকে মেশিন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। তার চিন্তার স্পষ্টতা আমার মনকে নাড়া দিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আমাকে হোভারক্রাফ্‌টে চড়াতে পার?'

ক্রাফ্‌টে আমরা দশ মিনিট চড়ে ছিলাম। তা ভূমি থেকে কয়েক সেন্টিমিটার উপর দিয়ে উড়ে গেল। যানটির পাইলট ছিলাম আমি। ভিজিটরটি বিস্মিত হলেন। আমার সম্বন্ধে তিনি আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। যানটিতে চড়ানোর জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি প্রস্থান করলেন। তিনি আগে তার পরিচয় আমাকে দেন নি। পরে আমি জানতে পারলাম তিনি টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিচার্সের প্রফেসর এম. জি. কে. মেনন। এক সপ্তাহ পরে আমি ইন্ডিয়ান কমিটি ফর স্পেস রিচার্স অর্গানাইজেশন (আইসিএসআর) থেকে ফোন করে রকেট ইঞ্জিনিয়ার পদের জন্য একটা সাক্ষাৎকার নেবার জন্য আমাকে আহ্বান করলেন। এই সংস্থার নাম পরে ইন্ডিয়ান স্পেস রিচার্স অর্গানাইজেশন (আইসিআরও) হয়।

সাক্ষাৎকার দেবার জন্যে বোম্বে গিয়ে আমি প্রফেসর বিক্রম সারাভাইকে দেখে বিস্মিত হলাম। তিনি ছিলেন (আইসিএসআর) এর চেয়ারম্যান। অন্যদিকে মেনন আর সারাফ ছিলেন এইসি (অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশন) ডেপুটি সেক্রেটারি। ইন্টারভিউ বোর্ডে প্রফেসর সারাভাই আমাকে প্রশংসা করায় আমি অভিভূত হলাম। তিনি আমার জ্ঞান আর দক্ষতা সম্বন্ধে কোন কিছু যাচাই করলেন না, বরং আমার সম্বন্ধে জানার ইচ্ছাই তার প্রশ্নের মধ্যে প্রকাশ পেল। এতে আমি তার প্রতি মুগ্ধ হলাম। তিনি যেন আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করলেন। ফলশ্রুতিতে তার মত একজন বড় মাপের মানুষ আমাকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখলেন।

পরবর্তীসন্ধ্যায় ওই পদের জন্য আমাকে মনোনীত করার কথা জানানো হলো। আমি ১৯৬২ এ নতুনভাবে গঠিত আইএসআরও) এর একজন রকেট ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগ পেলাম। এটা ছিল আমার জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা। প্রফেসর সতীশ ধাওয়ান আমাকে ইন্ডিয়ার উপগ্রহ উৎক্ষেপনের দায়িত্ব দিলেন ভেইকল প্রোগ্রামের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর হিসাবে।

≈

আমার জীবনের দ্বিতীয় সন্ধিক্ষণ ছিল ১৯৮২ এ ইন্ডিয়ার মিসাইল প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। ডিফেন্স ইন্‌স্টিটিউট অব ওয়ার্ক স্টাডি (ডিআইডবলুএস) এর ড. রাজা রামান্নার সাথে আমার মিলিত হবার ফলশ্রুতিতে আমি এই পদে নিয়োগ পেলাম। এখন ওই সংস্থা মিসৌরী ইন্‌স্টিটিউট অব টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট নামে পরিচিত, এখন ওখানে ডিফেন্স সিস্টেম ম্যানেজমেন্টের অফিসারদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এসএলভি-৩ এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টর হিসাবে কর্মরত থাকা কালে আমাকে ডিআইডবলুএস এর উপর একগুচ্ছ বক্তৃতা দেবার জন্য বলা হলো। প্রথম ভারতীয় উপগ্রহ রোহিনী কক্ষ পথে প্রেরণ করা হলো সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করলাম। ড. রামান্না তার লেকচারে বললেন কিভাবে তিনি ১৯৭৪ এ ভারতের প্রথম নিউক্লিয়ার টেস্ট সম্পন্ন করেন।

আমাদের লেকচার সম্পন্ন হবার পর আমরা উভয়েই দেরাদুন ভ্রমণ করি, সেখানে একদল বিজ্ঞানীর সাথে আমরা চা পান করলাম। দেরাদুনে থাকাকালে ড. রামান্না আমাকে হায়দ্রাবাদের ডিফেন্স রিচার্স এন্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট (ডিআরডিএল) এর পদ গ্রহণে প্রস্তাব দেন মিসাইল সিস্টেমের উন্নয়নের জন্য। হায়দ্রাবাদের এই ডিফেন্স রিচার্স এন্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট ল্যাবোরেটরির নাম পরে ডিফেন্স রিচার্স এন্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) হয়। আমি তাৎক্ষণিকভাবে তার অফার গ্রহণ করি। আমি সব সময়ই স্পেস রকেট টেকনোলজিতে মিসাইল টেকনোলজি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলাম। আইএসআরও এর চেয়ারম্যান ও আমার চিফ প্রফেসর ধাওয়ান কিন্তু আমার পরবর্তী মিশনে যেতে অনুপ্রাণিত করলেন না।

বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। আইএসআরও এবং ডিআরডিও এর মধ্যে অনেক পত্র বিনিময় হলো। পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ করার জন্য সেক্রেটারিয়েট অব ডিফেন্স অরগানাইজেশন এবং ডিপার্টমেন্ট অব স্পেস-এর মধ্যে অনেকগুলো মিটিংও অনুষ্ঠিত হলো। বিজ্ঞান উপদেষ্টা ড.ভি.এস অরুণাচলম তৎকালীন ডিফেন্স মিনিস্টার আর. ভেঙ্কটারমনের সাথে যোগাযোগ করে প্রফেসর ধাওয়ান এ বিষয়ে তার সাথে আলোচনার ব্যবস্থা করলেন। এই আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৮২ এর ফেব্রুয়ারিতে আমাকে ডিআরডিএল এর ডিরেক্টর পদে নিয়োগ দেওয়া হলো।

≈

১৯৯২ এর জুলাই এ আমি ড. অরুণাচলম-এর কাছ থেকে ডিফেন্স মিনিস্টার এবং ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স রিচার্স এন্ড ডেভেলপ্মেন্ট সেক্রেটারির বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার দায়িত্ব বুঝে নিলাম। এটাই ছিল আমার জীবনের তৃতীয় সন্ধিক্ষণ। ১৯৯৩ এ আমি তামিলনাড়ুর তৎকালীন গভর্নর ড. চেন্না রেড্ডির কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলাম মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর হবার জন্য। আমি এই দায়িত্ব পেলাম বাষট্টি বছর বয়সে। যা হোক, প্রতিরক্ষামন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধানমন্ত্রী পি. ভি নরসীমা রাও আমাকে বললেন যে আমি কয়েকটা জাতীয় প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও আমাকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার দায়িত্বও পালন করতে হবে। এখানে উল্লেখ করতে চাই, নরসীমা রাও এর সাথে কাজ করে আমি লক্ষ্য করেছিলাম রাও ডিফেন্স ইস্যু সম্পর্কে খুবই সক্রিয় ও সচেতন। বিশেষ করে দেশীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তার খুব আগ্রহ ছিল। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করার লক্ষ্যে তার দীর্ঘ মেয়াদি একটা ভিশন ছিল। আমি সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত ডিফেন্স মিনিস্টারের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছিলাম।

≈

১৯৯৮ এ নিউক্লিয়ার টেস্ট ছিল আমার জীবনের চতুর্থ সন্ধিক্ষণ। এগুলোর পিছনে একটা মজার গল্প আছে। আমাকে সেই গল্প বলার জন্য ১৯৯৬ এর মে এ ফিরে যেতে হবে। সে বছর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার মাত্র কয়েক দিন আগে আমি নরসীমা রাও এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'কালাম, তুমি তোমার দলবল নিয়ে নিউক্লিয়ার টেস্টের জন্য প্রস্তুত হও। আমি তিরুপতি যাচ্ছি। ক্ষমতা লাভের সময় পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ডিআরডিও-ডিএই এর টিম নিয়ে কাজে নামার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকবে।'

নির্বাচনে ভালো ফলাফলের জন্য ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করাই ছিল তার তিরুপতি সফরের আসল উদ্দেশ্য। যা হোক, ১৯৯৬ এর নির্বাচনের ফলাফল তার আশার বিপরীতছিল। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা নেমে দাঁড়ালো

১৩৬ এ। বিজেপি ও তার জোট মাত্র দুই সপ্তাহের জন্য বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ক্ষমতায় এলো। তারপর তৃতীয় ফ্রন্ট এইচ. ডি. দেবে গৌড়া প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। দু'সপ্তাহের জন্য ক্ষমতায় থাকলেও বাজপেয়ী সরকার নিউক্লিয়ার টেস্ট চালানোর জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিল।

রাত ৯টায় ৭ রেসকোর্স রোড থেকে আমি একটা ফোন পেলাম, তাতে আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে নতুন প্রধানমন্ত্রী ও বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী রাওয়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো। রাও আমাকে নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম সম্বন্ধে বাজপেয়ীকে বিস্তারিত তথ্যাদি জানাতে বললেন, যাতে নতুন সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামগুলো সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য হস্তান্তর করা সম্ভব হয়।

দু'বছর পরে বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ফিরে এলেন। ১৯৯৮ এর ১৫ মার্চ প্রায় মধ্যরাতে আমি বাজপেয়ীর কাছ থেকে ফোন পেলাম। তিনি বললেন তার কেবিনেটের মন্ত্রীদের তালিকা চূড়ান্ত করছেন। তিনি আমাকে মন্ত্রীসভায় নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি তাকে বললাম এ বিষয়ে আমার ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। তারপর তিনি আমাকে পরদিন সকাল ৯টায় দেখা করতে বললেন। বাজপেয়ীর ফোনের পরিপ্রেক্ষিতে মাঝরাতেই আমার কয়েকজন বন্ধুর সাথে আলোচনায় বসলাম। ক্যাবিনেটে যোগদান করা আমার উচিত কিনা সে সম্পর্কে আমরা রাত ৩টা পর্যন্ত যুক্তিতর্ক চালিয়ে গেলাম। একটা মোদ্দা কথা বের হয়ে এলো যে আমি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দুটো মিশনের সাথে পুরোপুরিভাবে সম্পৃক্ত। সেগুলো চূড়ান্ত সফলতার মুখ দেখার অপেক্ষায় আছে। সেগুলো ত্যাগ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করা আমার উচিত নয়।

পরদিন সকালে আমি ৭ সফদারজং রোডে গেলাম। ওখানেই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন। তিনি তার ড্রয়িংরুমে আমাকে স্বাগত জানিয়ে প্রথমেই বাড়ির তৈরি মিষ্টি খেতে দিলেন। আমি তাকে বললাম, 'আমি আমার দলবল নিয়ে দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামে ব্যস্ত আছি। একটা হলো অগ্নি মিসাইল সিস্টেম আর অন্যটি হলো ডিএই (ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটোমিক এনার্জি) এর অংশীদারিত্বে নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের সফল রূপায়ন ঘটানো সম্পর্কীত। আমি মনে করি এই দুটো প্রোগ্রামের সাথে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত থেকে আমি জাতির জন্য অনেক কিছু দান করতে অবশ্যই পারবো। অনুগ্রহ করে আমাকে ওই কাজগুলো চালিয়ে যাবার সুযোগ দেবেন।'

'তোমার কথার মধ্যে সামনে এগিয়ে যাবার অভিব্যক্তি আমি উপলব্ধি করতে পারছি। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।' বাজপেয়ী আমার কথার প্রেক্ষিতে বললেন। অগ্নি মিসাইল সিস্টেম থেকে পাঁচ পার্টটা নিউক্লিয়ার টেস্ট করার ফলে ভারত এখন নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অধিকারী দেশ। মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করার ফলে আমি দুটো বৃহৎ কাজ সমাধা করতে পেরেছি যা থেকে জাতি বিশাল ফল লাভের অধিকারী হয়েছে।

≈

আমার জীবনের পঞ্চম সন্ধিক্ষণ ছিল ১৯৯৯ এর শেষ দিকে, আমি ওই সময় ভারত সরকারের ক্যাবিনেট মিনিস্টারের পদমর্যাদার প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক এ্যাডভাইজার (পিএসএ) নিযুক্ত হলাম। আমার দলে যুক্ত হলেন ড.ওয়াই.এস.রাজন, ড. এম. এস. বিজয়ারাঘবন, তিনি ইলেক্ট্রোনিক এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স এর বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি আমার সাথে টিআইএফএসি তে কাজ করেছিলেন। এইচ. সেরিডন ছিলেন আমার ব্যক্তিগত সেক্রেটারি। আমি বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা থাকাকালে তিনি আমার স্টাফ অফিসার ছিলেন। কাজ শুরু করার সময় আমাদের কোন অফিস ছিল না। আমরা এক সময় অফিস পেলাম। এজন্য ডিআরডিও কে ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে ডিআরডিও এর সিভিল ওয়ার্ক এন্ড এস্টেট এর প্রধান কে. এন. রাই এবং ডিআরডিও তে থাকা আরএন্ডডি এর মেজর জেনারেল আর. স্বামীনাথনকে। ভারতের ২০২০ ভিশন ভারত সরকার কতৃক গৃহীত হলো। দেবে গৌড়া সরকারের আমলে প্রথম এই ভিশন পেশ করা হয়। ১৯৯৮ সালে আই. কে গুজরাল প্রধানমন্ত্রী হলেন তারপর আবার বাজপেয়ী। এই তিনটি সরকারই এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করে। আমরা বিজ্ঞানভবন অ্যানেক্সে একটা অফিস পেলাম। ওটা বিশাল ভবন, সেখানে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর অবস্থিত। বিজ্ঞানভবনের কাছেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের স্থান। অ্যানেক্সটা উপরাষ্ট্রপতির বাসভবনের কাছেই অবস্থিত। এখান থেকে সাউথ আর নর্থ ব্লকে গিয়ে কাজ করা বেশই সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল।

সাধারণত আমার কর্মসূচির মধ্যে ভ্রমণও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০০১ এর সেপ্টেম্বর এ আমি অল্পের জন্য হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা থেকে প্রাণে বেঁচে যাই। ঝাড়খন্ডের বোখারো স্টিল প্লান্টে হেলিকপ্টারটি অবতরণ করার সময় বিধ্বস্ত হয়। আমি লাফ দিয়ে বের হয়েই পাইলট আর কোপাইলটের কাছে ছুটে গিয়ে বললাম, আমার জীবন বাঁচানোর জন্য তোমাদের ধন্যবাদ, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।' পাইলটরা প্রায় কেঁদেই ফেললো। আমি কিন্তু তাদেরকে বললাম এমনটা ঘটা স্বাভাবিক। এখন আমাদেরকে সমস্যাটা খুঁজে বের করে সমস্যার সমাধান বের করতে হবে। ওইদিন সন্ধ্যায় আমার পাঁচটা অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হবে। আমাকে শ্রোতাদের সামনে বক্তৃতা দিতে হবে। শ্রোতাদের মধ্যে অফিসিয়াল, ইঞ্জিনিয়ার এবং স্টিল প্লান্টের স্টাফরাও উপস্থিত থাকবেন। বোকারোর কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর থাকার কথা। হেলিকপ্টার ক্রাস হবার খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। টেলিভিশনের জাতীয় চ্যানেলগুলোও এই খবরটা প্রচার করলো। আমি যখন ছেলেমেয়েদের সাথে মিলিত হলাম তখন তারা যেন কাঁপছিল। আমি তাদের সাথে করমর্দন করে তাদেরকে সাহস জুগিয়ে উৎফুল্ল করে তুললাম।

আমি তাদেরকে বললাম এটা একটা সাধারণ ঘটনা।

সাহস

ভিন্ন রকম ভাবার সাহস,
আবিষ্কার করার সাহস,
অপ্রত্যাশিত পথে ভ্রমণের সাহস,
সমস্যা মোকাবিলা করে সফল হবার সাহস,
এইগুলোই হচ্ছে যুবকদের চমৎকার গুণাবলি
আমার দেশের একজন যুবক হিসাবে
আমি অবশ্যই কাজ করবো সাহসের সাথে কৃতকার্য হবার জন্য
আর এটাই হচ্ছে আমার মিশন।

ওই একই দিনে একটা মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা ঘটে। সেই বিমান দুর্ঘটনায় মাধব রাও সিন্ধিয়া এবং আরো ছয়জন সাংবাদিক, তার স্টাফ এবং ক্রুরা নিহত

হন। এই দুটো দুর্ঘটনার খবরই রামেশ্বরমে আমার পরিবারবর্গের কাছে পৌছে, আমার বন্ধুবান্ধবসহ দেশে বিদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। আমি কেমন আছি জানার জন্য তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। আমি আমার ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আমার পরিবারকে আশ্বস্ত করি এই বলে যেসব কিছু ঠিকঠাক আছে আর আমি সুস্থ আছি।

পরে ওইদিন সন্ধ্যায় দিল্লি ফিরে এসেই আমি প্রধানমন্ত্রীর অফিসের একটা জরুরি বার্তা পেলাম। বার্তায় আমাকে বাজপেয়ীর সাথে দেখা করার অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছে। তিনি আমাকে স্বাগত জানিয়ে আমার দুর্ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আমাকে সুস্থ ও সবল দেখতে পেয়ে খুশি হলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন যে ইন্ডিয়া ২০২০ ভিশন এর ডকুমেন্ট নিয়ে শিল্পপতিদের সাথে আলোচনা করেছেন। ক্যাবিনেটেও আলোচনা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম পার্লামেন্টে ঘোষণা দেওয়া। কিন্তু এই ভিশনের মধ্যে কিছু কিছু সমস্যা আছে। আমি তাকে বললাম আমিও ওইগুলো নিয়ে ভেবেছি।

দুর্ঘটনার ফলে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো। একটা ছিল আমার বই **ইগনাইটেড মাইন্ডস** লেখা যাতে আমি তরুণদেরকে উৎসাহিত করলাম আমি যা করতে পারি তা আত্মা থেকে উৎসারিত। আর দ্বিতীয় ঘটনা হলো রাঁচি থেকে কুইলোন ভ্রমণ আর আম্মা...মাতা অমৃতানন্দময়ী এর সাথে সাক্ষাৎ। তার কাছ থেকে আমি আধ্যাত্মিকভাবে উদ্দীপ্ত হলাম। আমি রাষ্ট্রপতি হবার আগেই **ইগনাইটেড মাইন্ডস** প্রকাশিত হলো। বইটি সফলতার মুখ দেখলো। প্রচুর কপি বিক্রিও হলো। আম্মা একজন আধ্যাত্মিক সাধিকা। তিনি সমাজের কল্যাণের কাজে ব্রতী, বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অনাথ আর দুস্থদের সেবায় তিনি নিবেদিত। আমি তার সাথে দেখা করতে যাই আমার দু''জন বন্ধুকে সাথে নিয়ে। আমি তাদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেই পিএসএ থেকে পদত্যাগ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে পত্র দিতে। তারপর আমার ২০২০ ভিশন আর যথাযথ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে আমি মুক্তমনে আম্মার সাথে দেখা করতে গেলাম।

সে সময়টা ছিল পিএসএ পদ পাবার পর প্রায় দু'বছরের মাথায় ২০০১ এর নভেম্বর এ। পত্রে আমি লিখলাম আমি শিক্ষা কার্যক্রমে ফিরে যেতে চাই। অবশ্যই কারণটা ছিল গভীরে, আমি অনুভব করলাম যে পিইউআরএ (প্রোভাইডিং আরবান এমেনিটিস ইন রুরাল এরিয়াস) এবং আমার ভিশন ইন্ডিয়া ২০২০ এর ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত থাকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া ঠিক নয়।

কোথায় সমস্যার উদ্ভব? আমি চাচ্ছিলাম যতটা সম্ভব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটা প্রোগামের সফলতা। প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করে যথাযথ দায়িত্ব সম্পাদন করা দরকার। পরিবেশটা এমন সরকারের সিস্টেমের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে লক্ষ্যে পৌছানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মিশনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে বহু মন্ত্রণালয় এবং ডিপার্টমেন্টের উপর নির্ভর করতে হয়। তাদের লক্ষ্য আর প্রোগ্রামকে অবশ্যই বাদ দিয়ে নয়। কৃষি বিভাগের কথাই উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক। যদি কেউ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৪ নির্ধারণ করে তবে ওয়াটার রিসোর্সেস, পাওয়ার, ফার্টিলাইজার, কেমিক্যাল, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, পঞ্চায়েত রাজ, রেলওয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রয়োজন হবে। সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর জন্য সমন্বিত একই লক্ষ্যমাত্রা নেই। দ্বিতীয়ত, পিএসএ এর একটা এডভাইসারি ভূমিকা আছে, কিন্তু ডাইরেক্টরে কোন কতৃত্ব নেই। এইগুলোই হচ্ছে মিশনকে বাস্তবায়িত করার প্রতিবন্ধকতা। আর এ থেকেই আমি আমার এসাইনমেন্ট থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেই। আন্না ইউনিভার্সিটিতে টেকনোলজির প্রফেসর হিসাবে যোগদানই ছিল আমার জীবনের ষষ্ঠ সন্ধিক্ষণ।

রাষ্ট্রপতি থাকা কালে শেষ তিন মাসের সময় দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। আমি তার আগেই মনস্থ করে ফেলেছিলাম যে টিচিং প্রফেশনে ফিরে যাবার এবং ভারতের ২০২০ ভিশন বাস্তবায়ন করাই আমার লক্ষ্য। হঠাৎ করে জুলাইতে শাসক কংগ্রেস পার্টি রাষ্ট্রপতি পদে কয়েকজন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে দেখা যায়। বিরোধীরা অন্য রকম চিন্তা ভাবনা করতে থাকে। জাতি রাজনৈতিকভাবে সরগরম হয়ে উঠে। বিভিন্নদলের নেতারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তারা আমাকে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হবার জন্য পরামর্শ দেন। জনগণ, প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ এবং যুব সমাজ থেকে আমি বেশকিছু অনুরোধ গ্রহণ করি। অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে এবং ই-মেলের মাধ্যমে আমাকে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হবার জন্য অনুরোধ জানান। মনোনয়ন পত্র জমাদানের সময় নিকটবর্তী হলে রাজনৈতিক নেতাদের একটা দল আমার সাথে দেখা করেন। তারা আমাকে বলেন যে তারা শাসক দল সহ সমস্ত দলের সমর্থন পাবে যদি আমি নির্বাচনে দাঁড়াই।

আমি তাদেরকে বললাম যে যদি অধিকাংশ দল রাজি হয় তবে বিবেচনা করে দেখার সম্ভাবনা আছে। নেতারা আমার কাছে ফিরে এসে আমাকে জানালেন যে শাসক দল আমাকে প্রার্থী করতে রাজি নয়। তারা কিন্তু আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে আমি নির্বাচনে প্রার্থী হলে তারা আমার সাফল্য সম্পর্কে আস্থাশীল। কোন প্রকার ইতস্তত ভাব না দেখিয়ে আমি তাদেরকে বললাম যে যদি এমন হয় তবে আমি নির্বাচনে প্রার্থী হবো না। আমি বিশ্বাস করি রাষ্ট্রপতিভবন পার্টি পলিটিকস থেকে মুক্ত নয়। স্বভাবতই নেতারা আমার কথা মেনে নিলেন। একটা প্রেস রিলিজ ইস্যু করা হলো এই বলে যে আমি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হবো না। আমি সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি শিক্ষকতা, গবেষণায় ফিরে যাবো আর সেই সাথে আমি ২০২০ এর মধ্যে ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাবো।

আমি সব সময়ই বিশ্বাস করি কাপুরুষেরা কখনোই ইতিহাস তৈরি করতে পারে না। ইতিহাস তৈরি হয় জনগণের সাহস আর জ্ঞানের দ্বারা। সাহস হচ্ছে ব্যক্তি মানস থেকে উৎপন্ন, জ্ঞান উৎপন্ন অভিজ্ঞতা থেকে।

৪

পারস্পরিক সহমর্মীতায় রাষ্ট্রপতি

আন্তরিকতা হৃদয় থেকে উৎসারিত
সর্বশক্তিমান ছাড়া কেউ তা দিতে পারে না।

আমার জন্য রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার ছিল। এটা এমন একটা প্লাটফরম যেখান থেকে ইন্ডিয়া ২০২০ মিশনকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। তবে আমি বিশ্বাস করি, শুধুমাত্র পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্য, শাসকশ্রেণী, শিল্পী, লেখক, যুবসমাজ সহ সমস্ত নাগরিকের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। এই মিশনকে সফল করার জন্য সকলকে মুখোমুখি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রপতির পদ পাবার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই সুযোগ লাভ করলাম। আমি সামাজিক অঙ্গনের বিশেষ করে যুবক-যুবতী ও রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম হলাম। এটা ছিল আমার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের বাইরে অতিরিক্ত কাজ। রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক দায়দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সরকার যে পদক্ষেপই নেয় তার প্রত্যেকটি ভারতের রাষ্ট্রপতির দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। বিল এবং অর্ডিন্যান্স যা কিছুই সংসদে পাশ হয় তাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয় যা থেকে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষিত হয়। রাষ্ট্রপতি হিসাবে তার নিজের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা নেই। আমি অনুভব করলাম রাষ্ট্রপতি নাম মাত্র সরকার প্রধান। যদিও বিভিন্ন ফ্রন্টে কাজ করার সুযোগ রাষ্ট্রপতির আছে। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে সমাজের বিভিন্ন সেকশনের উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগতভাবে পার্টি কিংবা ক্ষমতায় আসীন জোটের শক্তি যাচাই করতে পারেন।

সংসদে ক্ষমতাসীন দলের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য না থাকলে তারা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি রাজ্যের গভর্নরদেরকে তাদের রাজ্যের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য উপদেশ দিতে পারেন।

রাজ্যের প্রধান হিসাবে তিনি জনগণের আশা আকাঙ্খাকে সংসদে তুলে ধরতে পারেন। আমার লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রপতিভবনকে জনগণের জন্য অধিক সহজলভ্য করে তাদেরকে বোঝানো জাতির সমৃদ্ধির জন্য তাদের অংশগ্রহণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যে জনগণের সাথে আমি সম্পৃক্ত হলাম পারস্পরিক সহমর্মিতায়।

প্রথমে আমি রাষ্ট্রপতিভবনে ই-গভার্ন্যান্স চালু করার পদক্ষেপ নিলাম। কম্পিউটার ব্যবহার করা হলো। আমি অনুভব করলাম এই প্রক্রিয়া আরো দ্রুততার সাথে করা দরকার। আমরা রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারিয়েটে আসা ফাইলপত্র, ডকুমেন্ট এবং পত্রাদিকে ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে বার কোডে রক্ষিত করার সিস্টেম প্রবর্তন করতে প্রয়াসী হলাম। অন্যদিকে, কাগজের ফাইলগুলো আর্কাইভে সংরক্ষিত থাকবে। তারপর থেকে ইলেকট্রোনিক যন্ত্রে সংরক্ষিত ফাইলগুলো প্রয়োজনে অফিসার, ডিরেক্টর, সরকারের সেক্রেটারি এবং রাষ্ট্রপতির কাছে বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে পাঠানো যাবে।

আমার স্বপ্ন ছিল একটা সিস্টেম চালু করা যার সাহায্যে রাষ্ট্রপতিভবনের সাথে প্রধানমন্ত্রী ও গভর্নরের অফিস এবং মন্ত্রণালয় সংযুক্ত হবে। **জি২জি** ই-গভার্ন্যান্স সিস্টেমের দ্বারা ডিজিটাল সিগনেচারের মাধ্যমে মেসেজিং নেটওয়ার্ক চালু করা হবে। আমরা সিস্টেমটা পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। এটা বাস্তবায়ন করার অপেক্ষায় ছিলাম। এক সময় আমি আশা করলাম আমার স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে। আমরা রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারিয়েটের নয়টা সেকশনে ই-গভার্ন্যান্স চালু করে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করলাম। স্বাভাবিকভাবে নাগরিকদের কাছ থেকে পাবলিক সেকশন -১ এ আসা কুড়িটা আবেদনের সিদ্ধান্ত নিতে এক সপ্তাহ সময় লাগে। অন্য দিকেই-গভার্ন্যান্স চালু করায় পাঁচ ঘন্টায় চল্লিশটি আবেদনের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হলো। আমি আশা করলাম রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলোতেও এই সিস্টেম চালু করা যেতে পারে।

≈

আমার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেবার প্রথম দিকে বিভিন্ন রাজ্য ও ইউনিয়ন টেরিটোরিস এর সদস্যদেরকে কয়েক দফায় রাষ্ট্রপতিভবনে ব্রেকফাস্টে দাওয়াত করলাম যাতে উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রাথমিক মতবিনিময় করা যায়। এই মিটিংগুলো ২০০৩ এর ১১ মার্চ থেকে ৬ মে এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হলো। তারা আমার মনের ইচ্ছাগুলো সম্পর্কে জানতে পারলেন।

প্রত্যেকটা মিটিং এর বিষয়গুলো নির্ধারণ করতে আমার টিম আর আমি কয়েক সপ্তাহ ব্যয় করি। আমরা প্রত্যেকটা রাজ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে সম্ভাব্যতা যাচাই বাছাই করে গবেষণা চালাই। আমরা প্লানিং কমিশন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলোর ও আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সম্পর্কিত ডকুমেন্টগুলো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করি।

তথ্যাদি পর্যালোচনা করে উপাত্তসমূহ গ্রাফিক ফরম আর মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করি। মিটিংগুলোতে সাংসদদের কাছে তিনটি ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আমরা আমাদের রূপরেখা তুলে ধরি। সেই রূপরেখাগুলো ছিল- ১) ভারতের উন্নয়নের জন্য ভিশন বা রূপকল্প ২) নির্দিষ্ট রাজ্য ও ইউনিয়ন টেরিটোরিস এর হেরিটেজ রক্ষণাবেক্ষণ ও ৩) হেরিটেজগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

বিহারের সাংসদদের সাথে আমাদের প্রথম মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। বিহার রাজ্যের উন্নয়ন করার লক্ষ্যে যেসব তথ্য উপাত্ত সাংসদরা তুলে ধরেন তাতে আমি উৎসাহিত হই। বিহারের সাংসদরা সভার সময় বাড়িয়ে দেবার অনুরোধ জানালে সময় বাড়িয়ে ৬০ মিনিট থেকে ৯০ মিনিট করা হয়। প্রশ্ন-উত্তর পর্বে বিহারের আসল চিত্র উঠে আসে। অনেক সাংসদ তাদের রাজ্যটির উন্নয়নের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে বক্তব্য পেশ করেন। মিটিং শেষ হলে আমরা সবাই খুশি হই। ব্যক্তিগতভাবে আমি মিটিংগুলোর প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করি। প্রত্যেক এলাকার অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আমি অবগত হই। সাংসদদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ফলশ্রুতিতে আমি সাংসদদের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পাই। মাঝে মাঝে আমি তাদের সাথে টেলিফোনে কথাবার্তা বলতে কিংবা সাক্ষাতে আলাপ-আলোচনা করতেও সক্ষম হই। বহু সংখ্যক বিশেষজ্ঞদের সাথে ইন্ডিয়া ২০২০ মিশনের বিষয়ে মতবিনিময় করতে থাকি। ব্রেকফাস্ট মিটিং এর ফলে আমি আমার মিশনের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশ্বস্ত হলাম। সাংসদরা আমাকে অনেক অনেক আইডিয়া দিলেন। আমি ২০২০ ইন্ডিয়া মিশন সম্পর্কে পার্লামেন্টে এবং বারটা স্টেট অ্যাসেম্বলিতে

কমপক্ষে নয়টা বক্তৃতা দিলাম। রাজ্যসমূহের পানি সম্পদ, কর্মসংস্থান, জনস্বাস্থ্য, গ্রামীণ যোগাযোগ, শিক্ষা প্রসার সহ নানা বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে সেই সমস্ত আমি সাংসদদের কাছে উপস্থাপন করলাম। আমি কেন্দ্রের ও রাজ্যের চেম্বার অব কমার্সে ইন্ডিয়া ২০২০ ভিশন বাস্তবায়নের জন্য বক্তব্য দিলাম। পরবর্তীকালে আমি ভিশন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে উন্নয়নের দশটি দফা পেশ করলাম। এই দশটা দফা কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সেই সম্পর্কে আমি পেশাজীবী এবং ব্যবসায়ী নেতাদের কাছে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করলাম।

এই দশ দফাগুলো হচ্ছে :

১. এমন একটা দেশ গড়তে হবে যেখানে শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য থাকবে না।

২. এমন একটা দেশ গড়তে হবে যেখানে বিদ্যুত ও পানির সমবন্টনের নিশ্চয়তা থাকবে।

৩. এমন একটা দেশ গড়তে হবে যেখানে কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতের মাঝে সমতা বজায় থাকবে।

৪. এমন একটা দেশ গড়তে হবে যেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে মেধাবী প্রার্থীদের জন্য সামাজিক আর অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে না।

৫. এমন একটা দেশ গড়তে হবে যেখানে সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রী, বিজ্ঞানী এবং বিনিয়োগকারীদেরকে সহায়তা দানের নিশ্চয়তা থাকবে।

৬. এমন একটা দেশ গড়তে হবে যেখানে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা থাকবে।

৭. এমন একটা দেশ গড়তে হবে যেখানে সরকার স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত আর জবাবদিহি থাকবে।

৮. এমন একটা দেশ গড়তে হবে যেখানে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্রতা, ও অশিক্ষা দূরীকরণ, মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধরোধ, নিরাপত্তাহীনতার অভাববোধ থাকবে না।

৯. এমন একটা দেশ গড়তে হবে যা হবে সমৃদ্ধশালী, স্বাস্থ্যবান, নিরাপদ, সুখ শান্তিতে ভরা টেকসই উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডের আধার।

১০. এমন একটা দেশ গড়তে হবে যা হবে বসবাসের জন্য সুন্দরতম স্থান যার ফলে এদেশের নেতৃত্বদানকারীদের প্রতি সবাই গর্বিত থাকবে।

ব্রেকফাস্ট মিটিং থেকে একথাই প্রকাশ পেল দেশের নেতাদেরকে দলাদলির উর্ধ্বে থেকে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যেতে হবে। রাষ্ট্রপতিভবন দলাদলি মুক্ত স্থান হতে হবে। জাতি দেখতে পাবে প্রত্যেক সাংসদের জন্য রাষ্ট্রপতিভবনের দ্বার উন্মুক্ত। সাংসদদের সাথে রাষ্ট্রপতিভবনের মিটিংয়ের সুবাদে আমি দুই হাউসে আরো দশবার ভাষণ দেবার সুযোগ পেলাম। আমার বক্তৃতা দেবার কালে সেন্ট্রাল হলে পিনড্রপ নীরবতা বিরাজ করতো। সংসদে আমাকে দু'ধরনের ভাষণ দিতে হয়। একটা ছিল পুরোপুরি সরকারের প্রথাগত ভাষণ, উদাহরণ স্বরূপ বলতে হয় পাঁচটা বাজেটকালীন বক্তৃতা, সেগুলোতে সরকারের উপস্থাপনা স্বত্ত্বেও আমি তার মাঝে আমার কিছু চিন্তা চেতনা অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম যার উপর আমি আলোচনা করতে চেয়ে ছিলাম। আর বক্তৃতাগুলো ছিল আমার নিজস্ব ধ্যানধারণা প্রসূত। বাজপেয়ী ও ড. সিং আমার পরামর্শগুলো গ্রহণ করতেন। আমি এই ফোরামে সাংসদদের কাছে ব্যক্ত করেছিলাম জাতি গঠনে তাদের দায়িত্ব আর ভূমিকার কথা। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ১৫০ বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে ২০০৭ এ আমি সাংসদদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করি। আমি আমার ভাষণে সাংসদদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম স্ব স্ব নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নের জন্য দায়িত্ববান হতে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, 'সত্যিকারের মুক্তি ও স্বাধীনতা আন্দোলন আজও শেষ হয় নি; আমাদের গল্প আজও ব্যক্ত হয় নি... এখন সময় এসেছে পার্লামেন্ট ও লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির জন্য সেই গল্প বলার। নতুন একটা ভিশন আর নেতৃত্ব আমাদের জাতিকে শুধুমাত্র আলোকিত, একতাবদ্ধ, একই সুরে গাঁথতে এবং সমৃদ্ধশালী করতেই পারে না, আরো পারে জাতিকে সুরক্ষিত আর উন্নত করে সীমান্তের আক্রমণকে প্রতিহত করতে...

জাতীয় নেতৃত্বকে আমাদের জনগণের আস্থা অর্জন কল্পে ন্যাশনাল মিশনের রূপরেখা তৈরি করা এবং তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছানো প্রয়োজন। বিগত ষাট বছরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য ভারত গর্বিত। আমরা কিন্তু অতীতের অর্জনের কথা ভেবে শুধুমাত্র তৃপ্ত থাকতে পারি না। প্রযুক্তি, শিল্প ও কৃষিতে সাম্প্রতিক কালে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার কথা না বললেই নয়। আমাদের বহুবিধ চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার প্রয়োজন হয়েছে। বহুদলীয় কোয়ালিশন নিয়মিতভাবে সরকার

গঠন করে আসছে। স্থিতিশীল সরকার গঠন করা দুই পার্টি সিস্টেমের উপরই নির্ভর করে। গ্লোবাল টেরোরিজম, নতুন ধরনের অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলার সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করা প্রয়োজন। আমি আরো বললাম, সম্মানীত সাংসদগণ, যখন আমি আপনাদের দেখি বিশেষ করে তরুণকে তখন আমি আপনাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, সুভাষচন্দ্র বোস, ড. আমবেদকর, আবুল কালাম আজাদ, রাজাজী সহ আমাদের বহু নিবেদিত নেতাদের আত্মার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাই। আপনারা কি পারেন ভারতের অন্যতম একজন হতে? হ্যাঁ,আপনারাও পারেন ২০২০ এর আগে আপনারা ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ, সুখী, শক্তিশালী সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে। সম্মানীয় সাংসদবৃন্দ, সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনাদের আছে কাজ করার অনেক অনেক উদ্যম পার্লামেন্টের ভিতরে এবং বাইরে। ইতিহাস আপনাদেরকে মহান কাজ সমাধা করার জন্য মনে রাখবে। সাহসী আর গতিশীল এই মিশনের জন্য আপনাদেরকে ক্ষুদ্র আর বিভেদমূলক কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

≈

যখন আমি অবিরতভাবে স্টেট অ্যাসেম্বলি ও পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্যদের কাছে ইন্ডিয়া ২০২০ এর ভিশনকে তুলে ধরার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলাম তখন আমার গভর্নরের অফিস ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়েছিল। একই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতিভবনে গভর্নরদের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০৩ এবং ২০০৫ এর সময়কালটা এ জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ২০০৫ এর গভর্নরদের কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী মনোমোহন সিং তার সরকারের ওয়াদা নিশ্চিতকরণ করেছিলেন এই বলে যে ভারত এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য কাজ করে যাবে। কনফারেন্সে দেওয়া তার উদ্দীপনাময় বক্তব্য ভুলে গেলেও তিনি যা বলেছিলেন তা বিশেষভাবে আমি স্মরণ করছি উন্নয়ন দ্রুততর করার জন্য এটা তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ওয়াদার কথা ছিল। বাজপেয়ী বলেছিলেন যে প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রত্যেকটা অংশকে অবশ্যই উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাকে চিহ্নিত করতে হবে এবং আগে ভাগে আমাদের লক্ষ্যমাত্রাকে উপলব্ধি করা লাগবে। আমি বুঝতে পারি একই লক্ষ্যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকে প্রণোদিত করে

কাজ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। গভর্নরদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের দিয়ে কিছু বলানো একটা অনধিকার ফ্যাশন। মোটের উপর এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করা যাতে প্রত্যেক অংশ গ্রহণকারী সমস্যাবলী চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান করার লক্ষ্যে আলোচনা করতে পারেন।

২০০৫ এর কনফারেন্সের প্রাক্কালে ড. মনোমোহন সিং রাষ্ট্রপতি অফিসের দ্বারা প্রণীত এজেন্ডার উপর ভিত্তি করে তার সমস্ত ক্যাবিনেট মেম্বারদের নিয়ে শিক্ষা, সন্ত্রাস, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আর ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাকসেশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন।। গভর্নরদের অবদানের আলোকে প্রধানমন্ত্রী মনোমোহন সিং অনেক এলাকার ব্যবস্থাপনা উন্নত করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তা ছিল রাষ্ট্রপতির নির্দেশিত আশারই প্রতিফলন।

≈

কোর্টের কেসগুলো ট্রায়ালকোর্টে ও হাইকোর্টে পেন্ডিং পড়েছিল। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বিস্ময়করভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। নতুন কেসগুলো ফাইল বন্দি অবস্থায় ছিল। মিলিয়ন মিলিয়ন কেস পেন্ডিং। কেসগুলো ফয়সালা করার জন্য প্রচুর সময়, অর্থ আর ভোগান্তি তো লেগেই ছিল। ২০০৫ এ আমি অল ইন্ডিয়া সেমিনার অন জুডিশিয়াল রিফরম এ বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেলাম। ওই সেমিনারে কোর্টের পেন্ডিং কেসের সম্বন্ধে বিশেষ রেফারেন্স অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি সেখানে একটা জাতীয় লিটিগেশন পেনডেন্সি ক্লিয়ারেন্স মিশনের প্রস্তাব রাখলাম। বিচার সমাধা করতে দেরি হবার কারণগুলো নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলাম। সেই কারণগুলো ছিল ঃ ১) প্রয়োজনীয় সংখ্যক কোর্টের অভাব; ২) প্রয়োজনীয় সংখ্যক জুডিশিয়াল অফিসারের অভাব; ৩)জুডিশিয়াল অফিসাররা কোন কোন কেসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে বিশেষায়িত নন; ৪) কেস শেষ হতে বিলম্বিত হয় আইনজীবীদের প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি দাখিল সংক্রান্ত বিলম্বে ৫) কোর্টের প্রশাসনিক স্টাফের ভূমিকা।

বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মামলাগুলো দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য আমি পরামর্শ দিলাম। লোক আদালত কার্যকর করা; একটা ন্যাশনাল লিটিগেশন পেন্ডেন্সি ক্লিয়ারেন্স মিশন স্থাপন; আরবিটেশন এর মতো কার্যক্রম পরিচালনা

করার জন্য আমি মতামত দিলাম। আমি আরো পরামর্শ দিলাম হাইকোর্টে পড়ে থাকা মামলার ক্ষেত্রে কতিপয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে। সেই কার্যক্রমের মধ্যে কেসগুলোর সময় বিশ্লেষণ করে শ্রেণিবিন্যাসকরণ। এতে এমন কেস সনাক্ত করা যাবে যেগুলো চালিয়ে যেতে বর্তমানে অনেকেই অনাগ্রহী।

আমার সুপারিশগুলোর মধ্যে ই-জুডিশিয়ারিসও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি সক্রিয় কেস ফাইলগুলোকে কম্পিউটারাইজ করারও পরামর্শ দান করি। এর ফলে কেসের বয়স নিরূপণ করে পেন্ডিং কেসগুলোর সংখ্যা হ্রাস করা যাবে। আমাদের প্রয়োজন একটা ডাটাবেস তথ্য ভান্ডার। ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম প্রবর্তনের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়াকে গতিশীল করা যাবে। অতিরিক্ত কার্যক্রমও নেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ভিডিও কনফারেন্সের কথা বলা যেতে পারে। এর ফলে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানো যেতে পারে। যেসব কেসে আসামীর সংখ্যা সে সবক্ষেত্রে ভিডিও কনফারেন্স অতি প্রয়োজনীয়। আইসিটি (ইনফরমেশন এন্ড কমুনেকেশন টেকনোলজি) এর ব্যবহারের ফলে সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ ও ক্রাইম সংঘটিত হওয়ার এলাকা চিহ্নিতকরণের বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে। অনেক দেশ বিশেষ করে সিংগাপুর, অস্ট্রেলিয়ায় পরীক্ষামূলকভাবে ইন্টারনেট কোর্ট চালু হয়েছে। এ সব দৃষ্টান্ত থেকে আমরাও বিচার প্রক্রিয়াকে আইসিটি ভিত্তিক করতে পারি। পরিশেষে আমি নিম্নে উল্লিখিত নয়টি সাজেশন প্রদান করলাম যা থেকে জুডিশিয়াল সিস্টেম আমাদের নাগরিকদের জন্য যথাযথ সময়ের মধ্যে বিচার কার্যক্রম সমাধা করতে পারবে।

১. বারের বিচারক ও সদস্যদেরকে বিবেচনা করে মামলার সংখ্যার সীমা নির্ধারণ করণ।
২. আমাদের কোর্টগুলোতে ই-জুডিশিয়ারী বাস্তবায়ন করণ।
৩. মামলার শ্রেণি বিভাগকরণ এবং ফ্যাক্ট ও সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী সেগুলোর গ্রুপ করণ।
৪. আইনের স্পেশিয়ালাইজড ব্রাঞ্চ যেমন মিলিটারি ল, সার্ভিস ম্যাটারেস, ট্যাক্সেশন এবং সাইবার ল এর জন্য আলাদা জজ নিয়োগদানকরণ।

৫. আমাদের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে লিগাল এডুকেশনকে ল স্কুলের ধাঁচে উন্নিত করণ।
৬. বিনা কারণে মামলা মুলতবী রাখলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান রাখা।
৭. হাইকোর্ট ও জেলা আদালতগুলোকে সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ মডেল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। স্বেচ্ছা ভিত্তিতে অতিরিক্ত ঘন্টায় এবং শনিবারে কাজ করার বিধান চালুকরণ।
৮. 'মাল্টি সেসনস ইন কোর্ট' চালু করণের লক্ষ্যে জনবল ও ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো বৃদ্ধিকরণ।
৯. পেন্ডিং কেসগুলোর নিস্পত্তি করার জন্য ন্যাশনাল লিটিগেশন পেন্ডেন্সি ক্লিয়ারেন্স মিশন প্রবর্তনকরণ।

এক সময় আমি দেখলাম আমাদের জুডিশিয়ারি এই পরামর্শগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে হয়, স্বামী ভারতে আর স্ত্রী আমেরিকায় প্রবাসী এক ডির্ভোসি দম্পতির দীর্ঘদিন পেন্ডিং একটা ডিভোর্স কেস ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়েছে শুনে খুশি হলাম।।

≈

পৃথিবীর মধ্যে অনুগত, শৃঙ্খলা আর সাহসে বলীয়ান অন্যতম আর্মড ফোর্সের অধিকারী ভারত। রাষ্ট্রপতি আর্মড ফোর্সেস এর সর্বাধিনায়ক। এই ক্ষমতার সুবাদে সেনাবাহিনী সম্বন্ধে আমাকে খবরাখবর রাখতে হতো। আমি সব সময়ই তাদের সাহস, শক্তিমত্তা, সমস্যা আর চ্যালেঞ্জসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলাম। আমি আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্সের কিছু সংখ্যক ইউনিট ভিজিট করি। অফিসার ও জওয়ানদের সাথে মতবিনিময় ছিল আমার ভিজিটের অন্যতম উদ্দেশ্য। আমি বিশেষ করে সিয়াচেন হিমবাহের কুমার পোস্ট যেতে পছন্দ করলাম। এটাই ছিল বিশ্বের উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্র। সেখানে আমাদের সৈন্যদল প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে ছিল। আমি বিশাখাপাত্নামের

উপকূলের সাবমেরিন অপারেশনও পর্যবেক্ষণ করলাম। সুখোই-৩০ এমকেআই এ প্রায় বাতাসের চেয়ে দ্বিগুণ গতিবেগে উড়ে গেলাম। সে এক উত্তেজনাকর অভিজ্ঞতা। আমি আপনাদের সাথে সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই।

≈

আমি ২ এপ্রিল ২০০৪ এ সিয়াচেন হিমবাহের কুমার পোস্টে অবতরণ করলাম। ঘাঁটিটা ৭,০০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এলাকাটা বরফে ঢাকা। তাপমাত্রা মাইনাস ৩৫ সেলসিয়াস, তার সাথে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস। যখন আমি ফিল্ড স্টেশনে পৌঁছিলাম তিনজন সেনা কর্ণাটকের নায়ক, পশ্চিমবঙ্গের উইলিয়াম এবং উত্তরপ্রদেশের সালিম আমার সাথে করমর্দন করলো। তাদের করমর্দনের উষ্ণতায় ওখানকার ঠাণ্ডা দূর হয়ে গেল। আমার মধ্যে আস্থার সঞ্চার হলে এই ভেবে যে আমাদের সেনারা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও শত্রুদেরকে পরাজিত করতে অবশ্যই পারবে। এ ধরনের প্রতিকূলতার মাঝেও অসাধারণ নেতৃত্বই শত্রুদেরকে প্রতিহত করতে সেনাদলকে উৎসাহ দান করে।

≈

২০০৬ এর ১৩ ফেব্রুয়ারি তে আমি নেভাল সাবমেরিন আইএনএস সিন্ধুরক্ষক যোগে পানির নিচ দিয়ে একটা জার্নি করলাম। সাবমেরিনটি ৩০ মিটার গভীরতায় চলছিল। ক্রুজটি যাত্রা করলো আমি কন্ট্রোল রুম দেখতে গেলাম। নাবিকটি সাবমেরিন কিভাবে কাজ করছে তা ব্যাখ্যা করতে লাগলো। নাভাল স্টাফ চিফ এডমিরাল অরুণপ্রকাশ এবং তরুণ নাবিক আর অফিসারদের সাথে আমি ক্রুজে পানির নিচে দিয়ে ভ্রমণ করে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। পর্যালোচনা কালে আমাকে পানির নিচের যোগাযোগ ব্যবস্থা, লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ এবং আক্রমণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা

করে দেখানো হলো। তারপর একটা টর্পেডো থেকে ফায়ারিং করে পানির নিচে নৌবাহিনীর শক্তি আমাকে প্রদর্শন করা হলো। আমি জাহাজে নব্বইজন অফিসার এবং নাবিকদের সাথে মিলিত হলাম। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত ছিল। তাদের কাজ সহজ ছিল না। তাদের চ্যালেঞ্জিং কাজের জন্য আমি গর্ব অনুভব করলাম। লাঞ্চে আমাকে সুস্বাদু নিরামিষ খাদ্য পরিবেশন করা হলো। পরবর্তী তিরিশ বছরের নৌবাহিনীর সাবমেরিন মিশনের প্ল্যান আমাকে প্রদর্শন করা হলো। তিন ঘন্টা পানির নিচে কাটিয়ে আমরা পানির উপরে ভেসে উঠে তীরে ফিরে এলাম। এটা ছিল আমার স্মরণীয় ভ্রমণ।

≈

২০০৬ এর ৮ জুন তারিখে সুখোই ৩০ ফাইটার এয়ারক্রাফ্‌টে আমি ভ্রমণ করি। কিভাবে এয়ার ক্রাফ্‌ট ফ্লাই করতে হবে সে সম্বন্ধে আগের রাতে উইং কমান্ডার অজয় রাঠোর আমাকে একটা নির্দেশনা দিলেন। তিনি আমাকে শেখালেন কিভাবে ওয়েপ্‌ন কন্ট্রোল সিস্টেম চালানোর সাথে সাথে বিমানকেও চালাতে হয়। আমি ইঞ্জিনিয়ার হবার পর ১৯৫৮ থেকে এটা করতে চেয়েছিলাম। সুখোই ৭৫০০ মিটার থেকে ২৫০০০ মিটার উচ্চতায় ঘন্টায় ১২০০ কিলোমিটার বেগে উড়তে লাগলো। উইং কমান্ডার রাঠোর অন্যদিকে টার্ন নিতে চাইলেন। এয়ার ক্রাফ্‌ট চালাতে অনেক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। আমার থ্রিজিএস এর গ্রাভিটেশনাল অভিজ্ঞতা ছিল। অবশ্যই জি-সুট এর ব্লাক আউটকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা ছিল। আমি এই এয়ার ক্রাফট যাত্রা থেকে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। আমি দেশীয়ভাবে নির্মিত মিশন কম্পিউটার, রাডার ওয়ার্নিং রিসিভার, ডিসপ্লে প্রোসেসর এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদির কর্মক্ষমতা অবলোকন করে খুবই খুশি হলাম। আমাকে দেখানো হলো শূন্য থেকে কিভাবে লক্ষ্যবস্তু স্থির করা হয়। এবং কিভাবে গ্রাউন্ড থেকে সিনথেটিক অ্যাপেচার রাডারের সাহায্য নেওয়া হয়, তাও প্রদর্শন করা হলো। উড্ডয়ন ৩৬ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে চললো। আমি

অনুভব করলাম এটা দীর্ঘকালের স্বপ্নের বাস্তবায়ন। আমি আমাদের প্যারামিলিটারি ফোর্স, রাজ্য পুলিশ পার্সোনল এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সাথেও মিলিত হলাম। তাদের সবার সেবা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করলো।

রাষ্ট্রপতি হিসাবে আমি আমার সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের সাথে মিলিত হবার সুযোগ লাভ করেছিলাম। আমি তাদের সাথে মিলিত হয়ে জনগণ, তাদের আশাআকাঙ্খা ও চ্যালেঞ্জকে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলাম। গুরুত্বপূর্ণ একটা কমন ন্যাশনাল মিশন বাস্তবায়নের জন্য জনগণ একত্রিত ছিল।

৫

আমি জাতিকে কী দিতে পারি?

ভিশন জাতির বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারে

আমি জাতিকে কী দিতে পারি? অন্যান্য দেশের কাছে আমাদের দেশের সম্মান ও মর্যাদা আছে। আমাদের দেশের কোটি কোটি নারী পুরুষের মুখে হাসি। শুধুমাত্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে এটা সম্ভব। সম্মান অর্জনের শ্রেষ্ঠ পথ শিক্ষা অর্জন। সৎ কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধই আমাদের জনগণকে উন্নয়নের মূলধারায় চালিত করা যায়।

স্বাধীনতা দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতিকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবার সুযোগ আছে। এই দুটো উৎসবের দিনে রাষ্ট্রপতি দেশের উন্নয়নের সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করেন। ইংরেজি ভাষায় ভাষণের পর হিন্দিতে ভাষণ দেওয়া হয়। যা হোক, প্রত্যেক ভাষণের শেষে আমি প্রথমে শুরু করা শুভেচ্ছা বাণী আবারও বলতাম। হিন্দি ভাষণে সারাংশটাই বলতাম। হিন্দির জ্ঞান আমার প্রাথমিক স্তরের। প্রজাতন্ত্র দিবসের ভাষণে সর্বদাই একটা থিম ছিল। আগে থেকেই একটা প্রস্তুতি নেওয়া হতো। আগে থেকেই কয়েকটা ড্রাফট করা হতো। তা দশটা কিংবা তারও বেশি অস্বাভাবিক ছিল না। ২০০৪-এর আর ডে এর বক্তৃতার ড্রাফট দশটা করা হয়েছিল। ২০০৫ এর ১৪ আগস্টের থিমটা ছিল উদ্দীপনাময়। ওই দিনকার ভাষণের ড্রাফ্‌ট করা হয় ১৫ টা। ২০০৭ এর ২৫ এপ্রিলে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ভাষণের সবচেয়ে বেশি ড্রাফট করা হয়। ৩৫ টা ড্রাফট করা হয়। আমার দায়িত্ব পালনকালে আমি দশটা জাতীয় পর্যায়ের ভাষণ প্রদান করি। ভাষণের বিষয়গুলো ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাতে মিশনের বক্তব্যেরই প্রতিফলন ছিল। আমার দেওয়া ভাষণগুলোতে আমি ভারতের উন্নয়নের কথাই ব্যক্ত করেছিলাম। আমার বক্তব্যের বিষয়গুলোতে সর্বজনগ্রাহ্য

আইডিয়া জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলাম, যাতে পেশাজীবী মানুষেরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, উন্নয়নের জন্য দেশে জাত্রোফা চাষের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাজ্য জাত্রোফা চাষ করে লাভবান হয়েছে। তাছাড়া জাত্রোফা চাষে বিশেষজ্ঞরা জাত্রোফা চাষে প্রসারকৃত আফ্রিকার দেশগুলো থেকে জ্ঞান আহোরণ করে আমাদের চাষিদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। বায়োফুয়েল উৎপাদনের জন্য তারা জাত্রোফা চাষ করেছিল। এটা পতিত জমিতেই ভালো ফলে। একবার চাষ করলে এক নাগাড়ে পঞ্চাশ বছর এই গাছ বেঁচে থাকে। প্রতি বছর যে ফল দেয় তার বীজ থেকে তেল পাওয়া যায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ছাত্রছাত্রীদেরকে যাচাই বাছাই করে তাদের উপযোগী শিক্ষা কার্যক্রমের কথা আমি তুলে ধরেছিলাম। সেন্ট্রাল বোর্ড অব এডুকেশন মার্কিং এর পরিবর্তে গ্রেডিং প্রথা চালু করার পরামর্শ দিয়েছিলাম, যাতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

নিজস্ব এনার্জি এর জন্য আমি একটা রূপরেখা তুলে ধরেছিলাম। আমি ২০২০ এর মধ্যে ৫৫,০০০ এম ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সৌর শক্তি প্ল্যান্ট গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছিলাম। ভারতের এনার্জির চিত্রটা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ভারত শুধুমাত্র এনার্জি চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগ মিটাতে সক্ষম। অন্যদিকে, প্রতিবছর বিদ্যুতের চাহিদা শতকরা ৫ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কয়লার উৎপাদন মাত্র শতকরা ১ ভাগ বেড়েছে। সারাদেশের অনেক রাজ্যে দিনে আট ঘন্টা বিদ্যুত বিচ্ছিন্ন থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরি।

আমাদের পরিবেশকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। কয়লা, তেল এবং গ্যাস ভিত্তিক পাওয়ার প্লান্টের সংখ্যা হ্রাস করা প্রয়োজন। বিদ্যুত উৎপাদনের জন্য সূর্য,বাতাস,আনবিক শক্তি ও হাইড্রো পদ্ধতির উপর জোর দিতে হবে। ২০২০ এর মধ্যে বাস্তবায়ন যোগ্য ২০.০০০ এম.ওয়াট শক্তির সোলার মিশন গ্রহণ করতে হবে। সৌরশক্তির উন্নয়নের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপও নিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, ফটোভোল্টিক সেলের ক্ষমতা ১৫ পার্সেন্ট থেকে কম পক্ষে ৫০ পার্সেন্টে উন্নিত করতে হবে। দিনের বেলার জন্য সৌর শক্তি আর রাতের জন্য বায়োফুয়েলের ব্যবস্থা করতে হবে। ফলশ্রুতিতে এনার্জি ধারাবাহিকভাবেই সহজলভ্য হবে। গুজরাটে প্রাইভেট সেক্টরের সাথে যৌথ উদ্দ্যোগে ৬০০ এম.ওয়াট সৌর শক্তি প্লান্ট চালু করা হয়েছে। প্রতিদিন তিন মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুত ব্যবহার করা হয় প্রতি ইউনিট ১৫ রুপি হিসাবে।

আজ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের একটাই ভিশন ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত জাতিতে পরিণত করা। এই সমস্ত উদাহরণের দ্বারা যে কেউ দেখতে পাবে যে রাষ্ট্রপতি সরাসরি নাগরিকদের সাথে সম্পৃক্ত যা থেকে জাতি উপকৃত হয়। আমি পার্লামেন্টে যে ভাষণগুলো দিয়েছিলাম তা আসলে জনগণের জন্যই। ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, আর ২০০২ এবং ২১ মার্চ ২০০৫-এ পার্লামেন্টে দেওয়া আমার ভাষণে আমি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের উপর বক্তব্য পেশ করেছিলাম।

আমি বললাম, ভারতের কৃষ্টি সভ্যতার সমন্বিত ধারা স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের মধ্যে নিহিত। প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে ফিরে যেতে হয় প্রাচীন যুগে। সেযুগে সভা আর সমিতি আমাদের গ্রামগুলোর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হতো। আজ আমাদের প্রজাতন্ত্রে একই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারা বর্তমান ছিল। আর এই ধারা প্রতিধ্বনিত হয় ভারতের সংস্কৃতিতে। ভারত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়ায় আমরা বিশেষভাবে গর্বিত। বহুধর্ম, বহুভাষা, বহু সংস্কৃতির দেশ ভারত। রাজনীতির দুটো ধারা আছে। আমরা জানি স্বাধীনতা আন্দোলনের লগ্নে লড়াই করা রাজনৈতিক দলগুলোর লড়াইয়ের কথা। যা হোক, আজ দেখতে হবে ভারতের জন্য কী প্রয়োজন? ২৬০ মিলিয়ন লোক দারিদ্রসীমার নিচে, শিক্ষিতের হার ৩৪ পার্সেন্ট, ৩৬ মিলিয়ন তরুণ-তরুণী চাকরি খুঁজছে। আমাদের মিশন ভারতকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা যাতে জনগণ দারিদ্রতা, নিরক্ষরতা আর বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন উন্নয়নকামী রাজনীতির।

আমি দেখতে পছন্দ করি এমন একটা অবস্থা যাতে আমাদের দেশে উন্নয়নকামী রাজনীতির চর্চা হয়। তাদের মেনোফেস্টোতে প্রতিফলিত হবে উন্নয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনৈতিক ভিশন। আর তা কেমন হবে সেটাই আমি ব্যক্ত করতে চাই।

১. মনে করুন পার্টি এ বলে, পনেরো বছরের মধ্যে আমরা ভারতকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করবো। প্রত্যেক পাঁচ বছরের জন্য একটা ডেভেলপমেন্ট গ্রোথ অর্জন করতে সক্ষম হবে। পার্টি বি বলে, একটা স্বচ্ছ পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা ভারতকে বিশ বছরের

মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করবো। পার্টি সি বিভিন্ন দিকদর্শন আর ধ্যানধারণার মাধ্যমে জাতিকে উন্নত করবো গ্লোবাল এরিয়ায় আমাদের ভূমিকায়। এতে একটা রোড ম্যাপ অবশ্যই থাকবে যাতে ভারত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হতে পারবে একটা সময় কালের মধ্যে।

২. আমার অভিপ্রায় দুটো, এ পার্টি বলে, আমরা একটা নেশন সৃষ্টি করবো যেখানে কোন বেকার থাকবে না। তারা পরামর্শ দেবে চাকরি প্রার্থীর চেয়ে চাকরি দাতার সংখ্যা হবে বেশি। পার্টি বি বলবে আমরা চাকরির নিশ্চয়তা দেব প্রশাসনযন্ত্র কোর্টে কোন মামলা পেন্ডিং রাখবে না আর আইনশৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। সমস্যা মুক্ত পরিবেশে জনগণ সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে শান্তিতে বসবাস করবে। পাটি সি বলে যে কোন ভারতীয় অভুক্ত অবস্থায় ঘুমাতে যাবে না। এর মাঝে একটা ভিশন আছে যা নিশ্চয়তা বিধান করবে যে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখবে। তারা বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্ব দান করবে সারা পৃথিবীতে। ভারত বসবাসের জন্য শান্তি, স্থিতিশীল সুন্দর স্থান হিসাবে বিবেচিত হবে।

৩. তৃতীয় দৃশ্যপটে, পার্টি এ বলবে, আমরা দশ বছরের মধ্যে প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে লেগে থাকা সীমান্ত সংক্রান্ত বিবাদ মিটিয়ে ফেলার নিশ্চয়তা বিধান করছি। পার্টি বি বলবে, আমরা পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে লেগে থাকা সীমান্ত সংক্রান্ত বিবাদ মিটিয়ে ফেলার নিশ্চয়তা বিধান করছি। পার্টি সি বলবে যে সীমান্ত বাণিজ্য জোরদার করার লক্ষ্যে আমরা বর্ডারলেস সীমান্ত বাণিজ্য চালু করবো। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে।

জনগণ নির্দিষ্ট পার্টিকে সুযোগ দিলে তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তখনই সমস্ত সদস্য বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে। দেশ এবং জনগণ মহান পার্লামেন্টের দ্বারা প্রশংসিত হবে। গণতন্ত্র উন্নত জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেককে সুযোগ দান করে। উন্নত জীবনযাপনের সুযোগ লাভ করলে জনগণ

বুঝতে পারবে জাতির ভিশন কী। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আর জ্ঞান নির্ভর পৃথিবীতে সুন্দরভাবে টিকে থাকার জন্য আমাদের সমস্ত জনগণের মাঝ থেকে সম্পূর্ণভাবে দারিদ্রতাকে নির্মূল করা অত্যন্ত জরুরি। আজকের জটিল পৃথিবীতে আমাদের জনগণের আর জাতির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাও একান্ত প্রয়োজন। 'রাজনৈতিক' রাজনীতি থেকে উন্নয়নের রাজনীতিতে উত্তরণের মাধ্যমে বহুবিধ অভাব নিরসন করা সম্ভব।

পার্টির ভাবাদর্শকে মোকাবিলা করে জাতীয় ইস্যুগুলোকে সামনে নিয়ে আসা উচিত। ভারতকে উন্নত জাতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে যাওয়া দরকার। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য বিশুদ্ধ পানি, সহজলভ্য বিদ্যুত, স্বাস্থ্যসেবা, আশ্রায়নের ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। তাছাড়া, যোগাযোগ ও কম্পিউটার ব্যবস্থাকে জনগণের হাতের কাছে পৌছে দেওয়াও সরকারের দায়িত্ব। জাতিকে সামনের কাতারে এগিয়ে নেবার জন্য পার্লামেন্টের ভূমিকা অপরিসীম। যে সমস্ত পুরুষ ও মহিলা সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত, তাদের মধ্যে দেশের উন্নয়নের জন্য আদর্শগত আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন অবশ্যই থাকতে হবে। আমি সাংসদদেরকে বলেছিলাম আমরা জেনেও এমন কিছু সত্যকে অস্বীকার করে থাকি। সেই সব কথা আপনাদের কাছে বলতে আমার দ্বিধা নেই। কারণ আমি আপনাদেরই একটা অংশ। আমি আপনাদের সবার মতোই পালামেন্টের একজন হয়ে আপনাদের মতোই সংসদীয় ব্যবস্থার সাফল্য কামনা করি। আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতা আছে। আসুন আমরা নিজেরাই সৎ হই। কিছু আসনে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগের অভিযোগ আছে। এর ফলে জনগণের মনে নির্বাচন সম্পর্কে বিরুপ প্রতিক্রিয়া হওয়া অসম্ভব নয়। রাজনীতি যখন কানাগলিতে রুদ্ধ হয়ে যায় তখনই তা আর সুষ্ঠ রাজনীত থাকে না। আসুন আমরা কোন প্রকার ঝুকির মধ্যে না গিয়ে আমাদের সংবিধানকে সমুন্নত রাখি, যাতে ভারত টেকসইভাবে সুস্থ গতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বেড়ে উঠতে পারে। ভারতীয় সভ্যতার আলোকে জনগণের জীবনধারা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে যেন আবর্তীত হয়। পার্লামেন্ট সঠিক রাজনীতির মাধ্যমে সঠিক কাজকর্মের দ্বারা জনগণের মুখে হাসি ফুটাতে পারে। জনগণের মধ্যে আস্থা আর বিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে। ভারতীয় জনগণ অতীতে কাজের দ্বারা বহবিধ অর্জন করেছে, তার নজির ভুরি ভুরি আছে। পার্লামেন্টের একটা মিশন থাকা প্রয়োজন যার উদ্দেশ্য হবে

যেসব পুরনো আইন অর্থনীতির গতিকে বাঁধাগ্রস্ত করে সেইগুলোকে চিহ্নিত করা এবং সেইগুলিকে বাতিল করার ব্যবস্থা নেওয়া। এর ফলে জনগণের বৃহত্তর অংশের মনে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ হবার আশা জাগবে। ভারত অবশ্যই আস্থা ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রগতির পথে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। আমাদের মহান পার্লামেন্টের সদস্যরাই এই পরিবর্তন আনতে পারেন। আমি তাদের প্রতি এজন্য উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমাদের মিশনকে সফল করার লক্ষ্যে পাঁচটি মূল লক্ষ্য স্থির করতে হবে। সেই লক্ষগুলো হলো ১) কৃষি ও ফল প্রক্রিয়াকরণ ২) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা ৩) অবকাঠামো উন্নয়ন : নির্ভরযোগ্য আর গুণগতসম্পন্ন বিদ্যুত ব্যবস্থা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দেশের সমস্ত অংশের অন্যান্য ক্ষেত্রের অবকাঠামো উন্নয়ন। ৪) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং জটিল প্রযুক্তি সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা।

এই পাঁচটি ক্ষেত্র পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদি সমন্বিত পন্থায় উন্নয়ন করতে হয়, তবে খাদ্য,অর্থ আর জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজন। গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্য অবকাঠামোকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য ব্যবহারিক,ইলেক্ট্রোনিক ও জ্ঞান এই তিনটির সাথে সম্পৃক্ততা বজায় রাখতে হবে। আর্থিক সচ্ছলতার প্রতিও নজর দেবার প্রয়োজন পড়বে। গ্রামের উন্নয়নের জন্য প্রোভাইডিং আরবান অ্যামেনিটিস ইন রুরাল এরিয়া (পিইউআরএ) এর আওতায় আনতে হবে। সারাদেশে পিইউআরএ এর ক্লাস্টারের সংখ্যা হবে ৭০০০।

আমাদের জিডিপি বছরে ৯ পার্সেন্টে পৌছালে আমরা খুশি। কিন্তু বাস্তবে এর দ্বারা এটাই প্রমাণ করে না গ্রামীন এলাকা এমন কি পৌর এলাকার বৃহত্তর জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা এখানে তুলে ধরতে পারি ন্যাশনাল প্রোসপারিটি ইনডেক্স (এনডিআই) কী? এটা হচ্ছে এ) বাৎসরিক জিডিপি,বি) দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত মানোন্নয়ন,সি) মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভারতের চমৎকার সভ্যতাভিত্তিক উত্তরাধিকার থেকে আসা মূল্যবোধের অবলম্বন এর সারসংক্ষেপ। তাহলে এনডিআই = এ+বি+সি। প্রকৃতপক্ষে, 'বি' এর অন্তর্ভুক্ত বাসস্থানের সহজলভ্যতা, নিরাপদ পানি, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসম্মত সেনিটেশন, মানসম্মত শিক্ষা,

মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, চাকরির সুব্যবস্থা, আর 'সি'এর কাজ যৌথপরিবার গঠন করতে উদ্বুদ্ধকরণ, সম্মিলিতভাবে কাজ করার স্পৃহা সৃষ্টি, সুস্থ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধকরণ, সামাজিক বৈশম্য দূরীকরণ সর্বোপরি সংঘাত মুক্ত সৌহাদপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা। ফলশ্রুতিতে পরিবার ও সমাজে দুর্নীতির মাত্রা হ্রাস পাবে। কোর্টের মামলা মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। শিশু ও মহিলাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসও কমে আসবে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা হ্রাস পাবে। ২০২০ এ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা শূন্যের কোটায় গিয়ে দাঁড়াবে। ন্যাশনাল প্রোসপারিটি ইনডেক্স উন্নত পর্যায়ে পৌছা তখনই সম্ভব হবে, যখন আমাদের সমস্ত প্রকারের প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

কেমন ভাবে আমরা আমাদের এই ভিশনকে উপলব্ধি করতে পারবো? এই ভিশন বোঝার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন?

আপনাদের অনেকের সাথে আলাপ আলোচনা করে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ের নানা প্রোগ্রাম, প্রাইভেট ও বেসরকারি সংস্থার নানা সভাসমিতিতে নানা জনের সাথে মতবিনিময় করে আমার মধ্যে আস্থা জন্মেছে যে আমাদের সমাজ এইসব মিশনে কাজ করতে প্রস্তুত। আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দিতে পারি এই বলে যে আপনারা দুটো গুরুত্বপূর্ণ মিশনে সম্মিলিতভাবে কাজ করুন।

১. এনার্জি ইন্ডিপেনডেন্স বিল প্রস্তুতকরণ : এনার্জি সম্পর্কে তিনটা দিক নির্দেশনা থাকবে যে গুলো থেকে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে।

২. ভিশন ২০২০ : একটা সিদ্ধান্ত প্রয়োগ যাতে ভারত রূপান্তরিত হবে একটি নিরাপদ, সমৃদ্ধশালী, সুখী আর আর্থিকভাবে স্বচ্ছল দেশে, যা ন্যাশনাল প্রোসপারিটি ইনডেক্স (এনপিআই) দ্বারা পরিমাপ যোগ্য হবে।

সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত বিলের বাস্তবতা গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করতে আপনারা আমার সাথে একমত হবেন।

এই ইস্যুগুলোকে আমি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে আমি আমার বক্তৃতায় তুলে ধরেছি এবং পরে তা বইয়ে গ্রন্থিত করেছি।

রাষ্ট্রপতিভবনে থেকে আমি চমৎকার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। যখনই আমি কোন নির্দিষ্ট রাজ্য কিংবা মন্ত্রণালয় ও সরকারি বিভাগের কোন ইন্‌স্টিটিউট এ কিংবা প্লানিং কমিশন কিংবা রাজ্য সরকারের কাছে সর্বশেষ তথ্য উপাত্ত চাইতাম তখনই তা রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারিয়েটে সরবরাহ করা হতো। এইসব তথ্য উপাত্ত থেকে আমার ভাষণের খসড়া তৈরি করা সহজ সাধ্য হতো। পার্লামেন্ট এবং বিভিন্ন রাজ্যের অ্যাসেম্বলিতে, পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় আমি সেই সব তথ্য উপাত্তকে উপস্থাপন করেছিলাম। আমি রাষ্ট্রপতি হবার আগে এই সুযোগ পাই নি।

রাষ্ট্রপতিভবনে আমার অবস্থান কালে আমি বারটা স্টেট অ্যাসেম্বলিতে ভাষণ দিয়েছিলাম। সেই সব ভাষণে আমি দেশের সমৃদ্ধির জন্য আমার ভিশনের কথা ব্যক্ত করেছিলাম। তথ্যাদি সংগ্রহ করে বিচার বিশ্লেষণ করতে এক মাসের মধ্যে পনরো দিন লেগে যেত। এই প্রস্তুতির জন্য ভার্চুয়াল কনফারেন্স রাষ্ট্রপতি ভবনের মালটিমিডিয়া ফ্যাকাল্টি থেকে পরিচালিত হতো। আলোচনার জন্য যখন বিশেষজ্ঞদেরকে পাওয়া যেত তখন এই কাজ চলতো সন্ধ্যা ৮টা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত। রাজ্যগুলো ছিল : জম্মু ও কাশ্মির, হিমাচলপ্রদেশ, গোয়া, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মিজোরাম, মেঘালয়, সিকিম এবং পণ্ডিচেরি।

রাজ্যগুলোর আর্থসামাজিক অবস্থা যাচাই করে এই রাজ্যগুলোকে নির্ধারণ করা হয়েছিল। রাজ্যগুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে পারক্যাপিটাল ইনকাম, লিটারেসি লেভেল, বেকারত্বের হার, দারিদ্র্যসীমার জনসংখ্যার হার, মাতৃত্ব আর মৃত্যুরহার, কৃষি, শিল্প আর চাকরির হার ইত্যাদি ফ্যাক্টরকে যাচাই-বাচাই করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ মিশন বিহারকে নির্ধারণ 'করেছিল এইসব তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে। ১) কৃষি আর উৎপাদিত ফসলের মূল্যের উপর ভিত্তি করে, ২) এডুকেশন ও উদ্যোগবিনিয়োগকারী, ৩) মানবসম্পদ, ৪) নালন্দা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ৫) হেল্‌থ কেয়ার মিশন, ৬) বন্যার পানির ব্যবস্থাপনা,৭) টুরিজম, ৮) অবকাঠামো, ৯) এক্সক্লুসিভ ইকোনোমিক জোন, ১০) ই-গভর্নেন্স। এই দশটা মিশন বাস্তবায়নের ফলে বিহারের পারক্যাপিটাল ইনকাম রুপি ৬৩০০ (২০০৫-০৬) থেকে রুপি ৩৫০০০ তে বৃদ্ধি পায় ২০১০ সালে। বন্ধুসুলভ পরিবেশের জন্য ২০০৫ এর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ১০ মিলিয়ন বেকার / আধা বেকারের মাঝ থেকে বিপুল সংখ্যককে চাকরি দেওয়া সম্ভব

হয়েছিল। বিহার সরকার ২০১৫ এর মধ্যে শিক্ষা আর চাকরির ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্র ধার্য করে এক শত পার্সেন্ট। সরকার বহু স্কিম গ্রহণ করেছিল। আজকের দিনে বিহার উন্নতিতে শীর্ষে থাকায় আমি খুশি হয়েছিলাম। রাজ্য অ্যাসেম্বলির সদস্যরা এই রাজ্যের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। আমি বিহার অ্যাসেম্বলিতে ভাষণ দেবার পর রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলরদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলাম। তাছাড়াও বিহার রাজ্যের চেম্বার অব কমার্সে এই থিমের উপর বক্তব্য পেশ করেছিলাম।

কেরালাতে মালইয়ালা মনোরমাতে কেরালার সমৃদ্ধির জন্য মিশনের কথাগুলোকে মালয়ালম ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছিল। জেলা পর্যায়ের ওয়ার্কসপগুলো পরিচালিত হয়েছিল মিশন যে সমস্ত বিষয় বাস্তবায়ন করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার আলোকে। ওয়ার্কসপগুলোর সিদ্ধান্তগুলো সুপারিশের আকারে রাজ্য অ্যাসেম্বলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অন্য রাজ্যগুলোর উন্নয়ন সম্পর্কে মিডিয়া সুন্দর কভারেজ করেছিল। আমি রাজ্যগুলোর বিভিন্ন সংস্থা থেকে অনেক অনেক ফিড ব্যাক পেয়েছিলাম।

একই কৃষ্টি আর মূল্যবোধের সুতোয় কোটি কোটি লোককে সম্পৃক্ত করাই আমার স্বপ্ন ছিল। আমাদের মহাকাব্যগুলো আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় আমাদের গৌরবময় অতীতের কথা। আর সেই ধারায়ই আমাদের সুন্দর ভবিষ্যত রচিত হবে।

৬

অন্যান্যদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ

যাদের কেউ নেই আমি তাদের রক্ষক হতে পারি
ভ্রমণকারীদের জন্য হতে পারি পথপ্রদর্শক।
আমি সেতু, নৌকা ও জাহাজ হতে পারি
যারা নদী পার হতে চায় তাদের জন্য।
- আচার্য শান্তিদেব
৮ম শতাব্দীর বৌদ্ধ পণ্ডিত

আমি সর্বদাই আমার মনটাকে সৃজনশীল কাজের দ্বারা ভরিয়ে তুলতে চাইতাম। এটা সহজ কাজ ছিল না। রকেট আর মিসাইলের উন্নয়নের জন্য একটা দলের প্রচুর কাজ করতে হয়। আমি চিন্তা করছিলাম মানুষের উন্নতির জন্য। ইন্ডিয়া ২০২০ ভিশন বাস্তবায়নের জন্য আমি ভাবনায় ছিলাম। রাষ্ট্রপতি হবার পর আমি অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করি। সমস্ত রকমের মতামত আর জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলো মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে ঋদ্ধ করে। আমার জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল আমার জীবনের এমন কয়েকটি ঘটনা এখানে বর্ণনা করতে পারি।

উপহারগুলো আমার জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

আমি এইসব ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করবো। আমার পিতা জনাব আভুল পাকির জয়নুল আবেদিন আমার বালক বয়সে আমাকে যথাযথভাবে শিক্ষাদান করেছিলেন। ১৯৪৭ এ ভারত স্বাধীন হবার পরের ঘটনা সেটা। রামেশ্বরম পঞ্চায়েতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। আমার পিতা ভিলেজ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হলেন। তিনি নির্দিষ্ট ধর্ম ও সম্প্রদায় এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন না। তিনি তার মনের মহানুভবতার জন্য প্রেসিডেন্ট হন।

যেদিন আমার পিতা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হলেন সেদিনই একজন মানুষ আমাদের বাড়িতে এলেন। আমি তখন স্কুলে পড়ি। আমি জোরে জোরে পড়ছিলাম। এক সময় আমি আমার দরজা ধাক্কা দেবার শব্দ শুনতে পেলাম। সেই সবদিনে রামেশ্বরমে আমরা কখনো দরজা বন্ধ করতাম না। একটা লোক আমার ঘরে ঢুকে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমার বাবা কোথায়। আমি তাকে বললাম বাবা এশার নামাজ পড়ছেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন যে তিনি আমার বাবার জন্য কিছু জিনিস এনেছেন। জিনিসগুলো কোথায় রেখে যাবেন, তা তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন। আমি তাকে সেগুলো চৌকির উপর রেখে যেতে বলে আমি পড়ায় মন দিলাম।

আমার বাবা ফিরে এসে চৌকির উপর একটা রূপোর প্লেটে কিছু উপহারসামগ্রী দেখতে পেলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কে এগুলো রেখে গেছে। আমি বললাম একটা লোক এসে এগুলো রেখে গেছেন। তিনি উপহারগুলো খুলে দেখলেন তার মধ্যে দামী কাপড়চোপড় আর কয়েকটা রূপোর কাপ, কিছু ফলমূল আর কিছু মিষ্টি আছে। তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠে এক পর্যায়ে রেগে গেলেন। আমি তার ছোট সন্তান। আমার বাবা আমাকে ভালোবাসেন। আমিও তাকে বড় ভালোবাসি। আমি প্রথম বাবাকে এমন রাগ করতে দেখলাম। আমি সেবারই তার হাতের মার খেলাম। আমি ভয়ে কেঁদে ফেললাম। পরে আমার বাবা আমাকে তার রাগের কারণ ব্যাখ্যা করে আমাকে উপদেশ দিলেন এই বলে যে তার অনুমতি ছাড়া কারো উপহার না নিতে। তিনি হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যখন একজন মানুষকে একটা পদ দান করেন তখন তিনিই তার হেফাজত করে থাকেন। যদি একজন মানুষ সর্বশক্তিমানের দেওয়া দানের ক্ষমতা বলে কারো কাছ থেকে কোন উপহার গ্রহণ করে তবে তা অবৈধ অর্জন হিসাবে বিবেচিত হয়।'

তারপর তিনি আমাকে বললেন যে কোন উপহার গ্রহণ করা ভালো অভ্যাস নয়। সব সময়ই উপহার দেবার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তাই এগুলো বিপদজনক জিনিস। এটা সাপের গায়ে হাত দেবার সমতুল্য। সাপের গায়ে হাত দিলে সাপ বিষ ঢালবে তাতে বিচিত্র কী। বাবার এই শিক্ষা আশি বছর বয়সে আজও আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। সেই ঘটনাটা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে আর তার ফলে আমার মধ্যে এটা মূল্যবোধ হয়ে গড়ে উঠে।

এমনকি এখনও কোন মানুষ উপহার সামগ্রী নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হলে আমার শরীর ও মন কেঁপে উঠে।

পরবর্তী জীবনে আমি মনু স্মৃতি বা মনুর আইন– হিন্দু চিন্তাচেতনা মৌলিক গ্রন্থ পাঠ করি। সেই গ্রন্থে উপহার গ্রহণ সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। মনু প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে দান গ্রহণের ফলে দানগ্রহীতাকে দাতার কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়। দাতা সুযোগ বুঝে গ্রহীতার কাছ থেকে অবৈধ ও অনৈতিক ফায়দা আদায় করে নেয়।

শিক্ষার মূল্যবোধ সৃষ্টির পদ্ধতি

কয়েক মাস আগে আমার বড় ভাই বয়স তখন নব্বই বছর রামেশ্বরম থেকে আমাকে ফোন করেন। ইউনাইটেড স্টেটস থেকে বেড়াতে আসা আমার এক বন্ধুর প্রসঙ্গে আমার সাথে তিনি আলাপ করলেন। বন্ধুটি আমার বড় ভাইয়ের সাথে আলাপ আলোচনা কালে আমার বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের বাড়িটা এত পুরনো কেন? ভাই জবাবে বলেন, "বাড়িটা আমার বাবা একশ' বছরেরও বেশি সময় আগে তৈরি করেছিলেন। আমার ছোট ভাই ও আমার উপার্জনক্ষম নাতি ছেলেরা বাড়িটা ভেঙ্গে নতুন একটা বাড়ি বানানোর প্রস্তাব দিয়েছে।" আমার বন্ধুটি তাকে বললেন যে তিনি এই ঐতিহাসিক বাড়িটা ভেঙ্গে ফেলা হোক তা চান না। তিনি বাড়িটাকে একটা ট্রাস্টের মাধ্যমে একটা জাদুঘর, একটা লাইব্রেরিতে রূপান্তর করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অন্যদিকে, আমার ভাই ও তার পবিবারবর্গের বসবাসের জন্য আর একটা বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি তাকে পরামর্শ দিলেন। আমার বড় ভাই জানালেন যে তিনি আমার বন্ধুর প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নন। আমি যে বাড়িটাতে বড় হয়েছি এবং নব্বই বছর কাল কাটিয়েছি সেই বাড়িটাকে জাদুঘর বানাতে পারি না। আমি ওই জায়গাটিতেই আমার আত্মীয়-পরিজনদের উপার্জিত অর্থে একটা নতুন বাড়ি বানাতে চাই। আমি এ ছাড়া অন্য কোন কিছু করতে চাই না। তুমি তোমার বন্ধুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধন্যবাদ জানিও।' এই কথাগুলো আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটলো। ওখানটাতে একটা মানুষ কারো সাহায্য ছাড়াই তার নিয়মে জীবন কাটিয়ে আসছেন। এটা আমার জন্য একটা বড় শিক্ষা। আমি আমার বড় ভাইয়ের মধ্যে আমার পিতার আদর্শের প্রতিফলন দেখতে পেলাম। আমার পিতা আমাদেরকে নিয়ে একটা ঐতিহ্যকে ধারণ করে ১০৩ বছর বেঁচে ছিলেন।

একজন হজ্জ্বযাত্রী

ব্যস্ত একটা দিন। আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য অনেক মানুষ এসেছিলেন। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া আর ফাইলগুলোতে মতামত দেবার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সেই মুহূর্তে আমার ভাইয়ের নাতি মক্কা থেকে ফোন করলো। সে একটা বিশাল বড় কাজের ব্যবস্থা করেছে। সেই কাজটা ছিল আমাদের পরিবারের তিন জন সদস্যকে তীর্থযাত্রায় যাবার ব্যবস্থা করা। সে আমাদের তিন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছে। নব্বই বছর বয়সী আমার বড় ভাই তার মেয়ে ও নাতি সাথে নিয়ে চেন্নাই থেকে ২০০৫ এর শেষ দিকে হজ্জ্ব করতে গিয়েছিলেন।

এই হজ্জ্বযাত্রা আমার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করলো। ভাইয়ের হজ্জ্বে যাবার ইচ্ছে পূরণ হওয়ায় আমি খুবই খুশি হলাম। আমার ভাইদের হজ্জ্বে যাবার সম্বন্ধে জ্ঞাত হবার জন্য সৌদি আরবে আমাদের দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রপতিভবনে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমার ভাইদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করার প্রস্তাব তিনি আমার কাছে রাখলেন। আমি তাকে বললাম, 'রাষ্ট্রদূত মহোদয়,আমার ভাইয়ের একটা অনুরোধ আছে যে তারা কোন প্রকার সরকারি সাহায্য ছাড়াই সাধারণ নাগরিক হিসাবে হজ্জ্বে যেতে চান। এটা তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা। আমার ভাই আমাকে বলেছেন যে তিনি হজ্জ্ব যাত্রার জন্য হজ্জ্ব কমিটির দ্বারা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনোনীত হয়ে হজ্জ্বে যেতে ইচ্ছুক। তার নাতি ব্যক্তিগতভাবে স্বাভাবিক পদ্ধিতে আবেদন জমা দিয়েছে। আল্লাহর রহমতে তারা হজ্জ্ব কমিটির স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই তাদেরকে হজ্জ্বে যাবার ব্যবস্থা করেছে। আমি আমার ভাইয়ের মেয়ে এবং তার নাতিকে বললাম হজ্জ্ব পালন কালে ভাইকে দেখাশোনার কথা বললে আমার ভাই তাতে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তিনি তার নাতিকে তার দায়িত্ব নিতে নিষেধ করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হজ্জ্ব পালন কালে তার নাতি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হলো। আমার ভাই এই অবস্থা মোকাবিলার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বাড়িতে কোন সমস্যা হলে যেমনটা দায়িত্ব তিনি নিয়ে থাকেন সেভাবেই। তিনি মসজিদে গেলেন, খাবার সংগ্রহ করলেন এবং তিনি নিজেই ডাক্তারকে খবর দিলেন। তার নাতি আমাকে বলেছিল যে তিনি তার পাশে দাঁড়িয়ে তিন ঘন্টা নামাজ আদায় করেন। তারপর তার নাতি আরোগ্য লাভ করে আবার হজ্জ্বের বিধিবিধান পালন করেছিল। হজ্জ্ব পালনের শেষ দিকে কী কী ঘটনা ঘটেছিল তার নাতি আমাকে বিস্তারিতভাবে বলতে লাগলো। মিনায় তাবুতে থাকার পর তাদেরকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে

রওনা হতে হয়। আরাফাতে পাঁচ মিলিয়ন হাজী জমায়েত হন। আমি কল্পনা করতে পারি আমার ভাই সেখানে তার হাত দু'খানা উপরের দিকে তুলে নামাজ আদায় করেছিলেন। একদিন নাতি গ্রান্ড মসজিদের উপর তলা থেকে নামাজ আদায় করে ফিরছিল। দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য হাজীরা এস্কালেটরের সিঁড়িতে পা রেখে নিচে নেমে আসছিলেন। এতো লোকের মধ্যে সিঁড়িতে পা রাখা কষ্টকর ব্যাপার ছিল। নাতিটি জনতার জটলার হাত থেকে বাঁচার জন্য দেওয়ালের সাথে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে ভালোভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না। হঠাৎ করে সে অনুভব করলো চাপটা বেশ একটু কমেছে, তার চারপাশটা বেশ ফাঁকা। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একজন আফ্রিকান তাকে ভিড়ের মাঝ থেকে রক্ষা করতে ছুটে এলো। এর মাঝে তারা গ্রাউন্ড ফ্লোরে পৌছে গেল। তাকে ধন্যবাদ দেবার আগেই সেই হাজীটি ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটা ছিল আরো মর্মান্তিক। আরাফাত থেকে নামাজ আদায় শেষ করে তারা মিনা ফিরে আসছিলেন। একই দিনে ১৫ মিলিয়ন হাজী ১৫ কিলোমিটার পথ গাড়ি দিয়ে সোজা মিনাতে ফিরে আসতে হয়। তাদের গাড়ির এয়ারকন্ডিশন ব্যবস্থা বিকল হয়ে যাওয়ায় মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ তাদেরকে সহ্য করতে হয়। আমার ভাই পানি ও খাবার খাওয়া থেকে বিরত থেকে সারাটা পথেই নামাজ পড়েন। গাড়ি ইঞ্চি করে এগোচ্ছিল। মিনায় পৌছাতে আট ঘন্টা সময় লাগে। ড্রাইভার পরিশেষে এক সময় তাদেরকে বাকী পথ পায়ে হেঁটে চলার জন্য পরামর্শ দেন। তাদেরকে আধা ঘন্টা পায়ে হেঁটে গন্তব্যে পৌছাতে হবে। ভাই সেই পরামর্শ মতো চলার সিদ্ধান্ত নিলেন। ভাইয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাতি তাকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে রওনা হলো। পথে সংকীর্ণ ছোট্ট একটা ভাঙ্গা। ভাই হুইলচেয়ার থেকে নেমে ওই জায়গাটা হেঁটে পার হচ্ছিলেন। দু'জন হাজী ভাইকে রাস্তার মাঝে বসে পড়তে দেখলেন। নাতি কিছু বলার আগেই সেই দু'জন হাজী ভাইকে হুইলচেয়ারে তুলে ওই জায়গাটা পার করে দিলেন। তাদেরকে ধন্যবাদ দেবার মতো সময় তারা আমার ভাইকে দিল না।

জায়গাটার নাম মুজদালিফা, তারা সেখানে খোলা জায়গায় রাত কাটালেন। মরুভুমির কনকনে ঠাণ্ডা রাত। তারা শুধুমাত্র একটা মাদুর পেতে সেখানেই রাত্রি যাপন করলেন। তাদের গায়ে ছিল শুধুমাত্র পাতলা কাপড়। পরদিন সকালে প্রাতকৃত্য সারার জন্য বিরাট লাইন। প্রত্যেক লোকই নিজের পালার জন্য অধীর আগ্রহে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছিলেন। অপর আর একটা

লাইনে একজন ভদ্রমহিলা প্রায় এক ঘন্টা অপেক্ষা করছিলেন। একজন তরুণী মেয়ে সাঁড়ি থেকে এগিয়ে এসে ভদ্র মহিলাটিকে সরে গিয়ে তাকে ভিতরে যাবার অনুমতি চাইলেন। সাঁড়িতে দাঁড়ানো অন্যান্য মহিলারা মেয়েটিকে ভিতরে যেতে দিতে বলায় তিনি মেয়েটিকে ভিতরে যেতে দিলেন। এই ঘটনার কিছু সময় পর একজন বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে তাকে আগে ভিতরে যেতে দেবার জন্য দাবি করলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন এই দৃশ্য দেখে ভাবলো ওই মহিলাটি আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে। তাদের মনে হলো এবার দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষমান মহিলাটি বৃদ্ধ ভদ্রমহিলাটিকে ভিতরে যেতে এবার হয়তো দিবেন না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বৃদ্ধ মহিলাটিকে ভিতরে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। একজন ভাবলেন, তারা একে-অপরের ভাষা বোঝে না। শুধুমাত্র ঈশারার উপর নির্ভর করে তারা চলেন। এই দৃশ্যাবলী থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে একটা ছোট্ট ঈশারাও আমাদের জীবনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সঙ্গীদের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে মানুষ নদীর মতো বহমান হতে পারে। সমস্ত রকমের ভেদাভেদ মুছে ফেলতে পারে। আমার ভাইয়ের মেয়ে নাজিমা আর নাতি গোলাম কে. মঈনউদ্দিনের বর্ণনা থেকে সেই কথাই আমি জানতে পেরেছিলাম

ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ

২০০৬ এ আমি কোইম্বাটুর সফর কালে ফিল্ড মার্শাল মানেকশ এর কাছ থেকে রাষ্ট্রপতিভবনে একটা টেলিফোন আসে। বিষয়টা আমাকে জানানো হলে আমি বললাম, আমি অবশ্যই ওয়েলিংটনের আর্মি হাসপাতালে তাকে দেখতে যাব। তারপর তার সাথে আমার প্রথম মিলিত হবার কথা মনে ভেসে উঠলো।

১৯৯০ এ একদিন আমি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস এর বিমানে ভ্রমণ করছিলাম। আমি আমার পাশে এস, এইচ, এফ. জে স্যাম মানেকশ কে দেখতে পেয়ে আমি তার কাছে নিজেকে আরএম(রক্ষা মন্ত্রী অর্থাৎ ডিফেন্স মিনিস্টার) এর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসাবে নিজের পরিচয় দিলাম। আমি এই কথা বললে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি কি তার ভালো সফর সঙ্গী?' তারপরই তিনি আমাকে বললেন 'আপনার বয়স কত হলো?' আমি বললাম যে আমার বয়স উনষাট বছর। তিনি সেকথা শুনে বলে উঠলেন, 'সবে বাচ্চা মাত্র। আমি

ভাবতেই পারি নি তিনি আর্মড ফোর্সের সুপ্রিম কমান্ডার মানেকশ। আমি তার রুমে প্রবেশ করা মাত্র তিনি প্রত্যেককে বাইরে যেতে বললেন। তিনি আমাকে কাছে বসিয়ে আমার হাতটা নিজের হাতের মাঝে নিয়ে বললেন, 'তুমি কেমন ধরনের রাষ্ট্রপতি আমি ক্ষমতায় নেই তবুও তুমি আমাকে সম্মান করছো।' তিনি আমাকে কাছে পেয়ে বড়ই খুশি হলেন। তিনি তখন বেশই বৃদ্ধ, শয্যাশায়ী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। তখন পর্যন্ত তার মনটা আমাদের সেনাবাহিনীর উন্নতির জন্য ভাবিত ছিল। তিনি বললেন, 'তা ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হবে। একটা মজার প্রশ্ন করলেন, 'কালাম, তুমি কি আমাকে বলতে পার অন্যদশকে বর্তমানের অস্ত্রপাতি কি অকেজো হয়ে পড়বে না? আর তার জায়গায় ইলেক্ট্রোনিক আর সাইবার যুদ্ধাস্ত্র স্থান করে নেবে না? মানেকশ এর এই প্রশ্ন আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করলো। আমি একজন আধ্যাত্মিক নেতার সাথে মিলিত হবার পর পৃথিবী নিউক্লিয়ার অস্ত্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে এই বিষয়টা নিয়ে তার সাথে আলোচনা করেছিলাম। আমি ফিল্ড মার্সালকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?' তিনি বললেন 'আমি জানি না, তবে একটা জিনিস তোমাকে আমি বলতে চাই, দেশের একজন ফিল্ড মার্শাল কিংবা সমমর্যাদার একটা জাতির জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।' তার এই মন্তব্যও আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটলো।

আমি দিল্লি ফিরে এসেই প্রধানমন্ত্রীর সাথে অন্যান্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এ বসলাম। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বললাম দেশের জন্য ফিল্ড মার্শাল মানেকশয়ের চরমতম সেবাদানের জন্য তার প্রতি আমাদের আরো অনেক কিছু করা প্রয়োজন। ওই দিনই সফররত বিদেশি অভ্যাগতদের সম্মানে আয়োজিত ডিনারে উপস্থিত আর্মি চিফ ও এয়ার চিফের সাথে আমি মিলিত হলাম। এয়ার ফোর্স চিফ গুরুত্ব দিয়ে বললেন যে ফিল্ড মার্শাল মানেকশ ও বিমান বাহিনীর অর্জুন সিং এর প্রতি যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শন করা প্রয়োজন। আমি তাৎক্ষণিকভাবে আমার সেক্রেটারি পিএম নায়ারকে তলব করলাম প্রয়োজনীয় নোট তৈরি করে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানোর উদ্দেশ্যে। সরকার স্বাদরে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলো। দেশের জন্য তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তার ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। ফিল্ড মার্শাল মানেকশয়ের জীবিত কালেই তার অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ায় আমি খুশি হলাম।

অনুকরণীয় খুশবন্ত সিং

আমি খুশবন্ত সিং এর সাথে মিলিত হয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। সে সময় তার বয়স ছিল নব্বই। আমি তার লেখা বেশ কয়েকটা বই ততদিনে পড়ে ফেলেছি। 'হিন্দুস্তান টাইমসে' তার কলাম আমি নিয়মিত পড়ি। আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করলেন কেন আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। তাদের প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, আমি বিশেষভাবে তার লেখা বই পছন্দ করি। খুশবন্ত সিং একজন নিবেদিত লেখক নব্বই বছর বয়সেও। তিনি ২০০৭ পঁচানব্বই বছর বয়সেও তিনি আমাকে নিয়ে লিখেছেন। তার মতামত আর আমার মতের সাথে যে বিষয়ে মিল পেয়েছিলাম তার সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরছি।

কয়েক মাস আগে প্রজাতন্ত্রের একাদশতম রাষ্ট্রপতি তার পুরো পাঁচ বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ করে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি তৃতীয় মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন ছিলেন। এটাকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের নিদর্শন হিসাবে আমরা দাবি করতে পারি। আমাদের প্রতিবেশিদের এটা শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে।

তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্মে, কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাবেন, না সন্ন্যাস নিবেন সে বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই। তার সাথে আমার আধা ঘন্টা কাটানোর সুযোগ হয়েছিল। তিনি আমার বাসায় এসে আমাকে সম্মানীত করেছিলেন। রাষ্ট্রের প্রধান একজন সাধারণ কলমজীবীর বাসায় আগমন করায় তার মানবিক গুণাবলীর কথা অনেকেরই মুখে মুখে ফেরে।

আমরা তামিল খুব কমই জানি। তিনি একজন তামিল। আমি তামিল ভাষার দুটো শব্দ জানি, সেই শব্দদুটো হচ্ছে ভেনাক্কাম ও অই-ইয়ো। যদিও কালাম প্রগাঢ়ভাবে একজন ধার্মিক মানুষ। আমি একজন অজ্ঞেয়বাদী,আমি বিশ্বাস করি বিজ্ঞান আর ধর্ম এক সাথে চলতে পারে না। একটা কার্যকারণের উপর প্রতিষ্ঠিত আর অপরটি বিশ্বাসের উপর। আমি তার সাথে কথা বলে এবং তার লেখা বইপত্র পড়ে জেনেছি, তার ধর্মীয় বিশ্বাস মহাত্মা গান্ধীর মতো। বাপুর সবকিছুকে আমি গ্রহণ করতে অপারগ হলেও আমি নিজেকে একজন গান্ধীয়ান বলে বিবেচনা করি। কালাম আমাকে দেখান বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যদি আপনি বিশ্বাস করেন বিচারের দিনের পুরস্কার কিংবা শাস্তির বিষয়ে, তবে আমাদেরকে পরকালের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। তিনি জবাবে বললেন, 'স্বর্গ ও নরক মনের মধ্যে...'

তাহলে ঈশ্বর সম্বন্ধে কালামের কনসেপ্ট কী? তার ধারণাটা আল্লাহ্ বনাম ঈশ্বর, খুদা ভগবান নয়। তিনি মসজিদ কিংবা মন্দিরের খোঁজ করেন না ; তিনি লড়াই করে শহীদ হতে চান না বিভিন্নধর্মের প্রধানদের মতো। অন্যেরা একে-অপরের রক্ত ঝরায় ঈশ্বরের নামে গর্জন করে।

হঠাৎ আলোর ভিতর থেকে মেঘের একটা গর্জন,
আমি তোমাদের কারোই নই! সবাই শোন!
'ভালোবাসা আমার মিশন আর তোমরা সময় কাটিয়ে দিলে ঘৃণা প্রকাশ করে,
আমার আলোকে হত্যা করে তোমরা জীবনকে রুঢ় করো
তোমরা সবাই জেনে রাখ : খোদা আর রাম
উভয়েই এক, ভালোবাসায় প্রস্ফুটিত।'

কোন যুক্তিবাদী কালামের স্বর্গ সম্পর্কিত ভিশনের বিরুদ্ধাচারণ করতে পারি না। কেউ কেউ বলেন ঈশ্বর সত্য, অন্যরা বলেন ভালোবাসা। ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে কালামের কনসেপ্ট হচ্ছে অপরের দুঃখে দুঃখবোধ করা...

আমি তার লেখা থেকে উদ্ধৃতি করছি কারণ আমি মনে করি একজন লেখকের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য সম্মান যিনি তার অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন আমার কাজ বিশ্লেষণ আর ঈশ্বর, ধর্ম সম্বন্ধে আমার পন্থায় চিন্তাভাবনা করেছেন যা থেকে উত্তম মানুষের উদ্ভব ঘটে।

আমাদের অর্জনকে বিলিয়ে দেওয়া

আপনাদের অনেকেই সম্পদের অধিকারী হতে পারেন। এখানে আমি একজন মহান মানুষের গল্প বলবো। তিনি পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে স্বাধীনভাবে বসবাস করেন। আমি ২০০৭ এ সিদ্ধাগঙ্গা মঠে শ্রী শ্রী শিবাকুমারা স্বামীগালু এর ১০০ বছর পূর্তি বার্ষিকী উদ্বোধন করার জন্য আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম সেখানে বিশাল জমায়েত। লাখ লাখ ভক্ত উপস্থিত হয়ে ভক্তি জানাচ্ছে। ডায়াসে অনেক রাজনৈতিক নেতা ও আধ্যাত্মিক গুরুরা উপবিষ্ট আছেন। তারা সবাই বক্তব্য পেশ করার পর স্বামীজী হাতে কোন কাগজপত্র না নিয়েই বক্তব্য দেবার জন্য উঠলেন। তিনি ভক্তদেরকে আশীর্বাদ করে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিলেন। আমি এই দৃশ্য অবলোকন করে বিস্মিত

হলাম। ১০০ বছরের বৃদ্ধ ভবিষ্যতদ্রষ্টা একইভাবে হাসি হাসি মুখে বক্তৃতা দিলেন। আমার মনের মধ্যে এক ধরনের অনুসন্ধিৎসা জাগলো তিনি কেমন করে এতটা উদ্দীপনার সঙ্গে এত সুন্দর বক্তব্য পেশ করলেন। আমি ভাবলাম মুক্ত মনে বক্তব্য দেবার কারণে এটা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তিনি শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অনেক অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রতিদিন তিনি হাজার হাজার দরিদ্র মানুষের খাবার যোগান। সেবা প্রদানের অক্লান্ত কার্যক্রমের জন্য নিরক্ষতা দূরীকরণ করতে পেরেছেন। ফলে এই এলাকার ছিন্নমূল মানুষেরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে। আমি তার উদ্দেশ্যে লিখলাম।

আমি কী দিতে পারি?
ওহ আমার সাথী দেশবাসী,
সুখ দিলে তোমরা সুখ পাবে
শরীর আর মনে।
তোমাদেরকে সব কিছু দেওয়া হবে,
যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তবে ভাগ করে নাও।
যদি তুমি সম্পদশালী হও, তবে অভাবীদেরকে ভাগ দাও।
তোমার মন আর হৃদয়কে ব্যবহার করো।
কষ্টে আছে যারা তাদের কষ্ট দূরে হঁটিয়ে দাও
কষ্টে ভরা হৃদয়কে উৎফুল্ল করে তোলো।
কিছু দান করলে তুমি সুখ পাবে।
তোমার সব কাজের জন্য সর্বশক্তিমান তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে মতবিনিময়

আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে **ডিআরডিআই** এর ডিরেক্টর,ডিফেন্স মিনিস্টারের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, ক্যাবিনেটের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে মতবিনিময় করেছিলাম। বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যেমন ড. সতীশ ধাওয়ান, ড. রাজা রামান্না, ড. ভি. এস. অরুণাচলম, আর. ভেঙ্কাটারমন, পি.

ভি. নরসীমা রাও, এইচ. ডি. দেবে গৌড়া, আই. কে গুজরাল, অটল বিহারী বাজপেয়ী ও ড. মনমোহন সিং এর সাথে আলাপ আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। তাদের সঙ্গে মতবিনিময় অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। তারা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। আমার বস এবং আইএসআরও এর চেয়ারম্যান ড. সতীশ ধাওয়ানের কাছ থেকে শিখেছিলাম জটিলতর সমস্যার মুখোমুখি হলে চ্যালেঞ্জের জবাব দিয়ে সমস্যাকে প্রতিহত করার মন্ত্র। তিনি বলতেন সমস্যা যেন তোমার মাথায় চেপে না বসে, তোমাকে সমস্যা মোকাবিলা করার শিরোমণি হতে হবে, তাহলেই তুমি সমস্যাকে মোকাবিলা করে সফলতার মুখ দেখবে। এটাই হচ্ছে জটিল মিশনের মূলমন্ত্র। ড. রাজা রামান্না, ড. ভি. এস. অরুণাচলম আমাকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে ব্যক্তির মূল্যবোধ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে সঠিক ব্যক্তির কাছ থেকে জটিল কাজ সমাধা করতে হয়। ডিফেন্স মিনিস্টার হিসাবে আর.ভেঙ্কটারমন দেখিয়েছিলেন কিভাবে বিশাল একটা ফোর্সকে পরিচালনা করার জন্য যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নরসীমা রাও ছিলেন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ। দেশের উন্নয়নের জন্য তার প্রতিটা বিষয়েই যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। একবার তিনি ডিফেন্স কনসাল্টিভ কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করার সময় সাপ্লাইস এন্ড ট্রান্সপোর্ট এএসসি (আর্মি সাপ্লাই কোরপস) এর ডিরেক্টর জেনারেল ডেইরী ফার্মের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা উপস্থাপন করলেন। তার প্লান উপস্থাপনা কালে তিনি বললেন মহিষগুলোর স্থলে জার্সি গাভী পালন করা যেতে পারে। রাও তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করলেন আমাদের দেশে মহিষ পালনই লাভজনক। তারা আমাদের এই গরম দেশে সস্তা খাবার খেয়ে উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ দুধ দিতে পারে। দেশীয় সম্পদের ক্ষতি করার কথা ভাবা ঠিক নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টা পর্যালোচনা করে দ্রুততার সাথে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য রাও আর্মির ডেইরী ফার্মকে নির্দেশ দিলেন।

অন্য আর এক উপলক্ষ্যে ১৯৯৫ এ আমি আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে প্রতিবেদন উপস্থাপন করি, রাও সেটা দেখে তাৎক্ষণিকভাবে জানালেন আমাদের জিডিপি এর চেয়ে তিন পার্সেন্ট নিচে গিয়ে দাঁড়াবে। তিনি বললেন, 'আমরা একটা লিমিট বেঁধে দিতে পারি না। আমাদের এমনটাই করা উচিত যাতে জাতির জন্য শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। জিডিপি অবিরতভাবেই উঠানামা করে থাকে। হিসাবের খাত থেকে আমরা ব্যয় বাড়াতে কমাতে পারি না।

আর একটা উদাহরণ আমার মনে আছে। ডিআরডিও অগ্নি মিশাইল সিস্টেমের জন্য ফলো আপ প্রোগ্রাম নিতে চাওয়ায় রাও বিষয়টা উপলব্ধি করে ৮০০ কোটি রুপির একটা প্রোগ্রাম তাৎক্ষণিকভাবে অনুমোদন করলেন। এই অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাবের ফাইল তখনকার অর্থমন্ত্রীর হাত ঘুরে ভারত সরকারের সেক্রেটারিদের কাছে এলো। এটাই ছিল উচ্চপর্যায় থেকে আসা প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কথা।

২০০৪ এ ড. মনমোহন সিং এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি অর্থনীতি সম্পর্কিত সমস্ত দক্ষতা কাজে লাগিয়েছিলেন যাতে সাম্প্রতিক বছরে গ্রোথ ৯ পার্সেন্ট হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীর অফিসে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করে সবাইকে কাজে ব্যাপৃত করেছিলেন। তরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অটল বিহারী বাজপেয়ীর কর্মদক্ষতাকেও আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলাম। ১৯৯৮ এ প্রধানমন্ত্রী হওয়া মাত্র তিনি আমাকে নিউক্লিয়ার টেস্ট করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, বাজপেয়ী জাতীয় ইস্যুতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হন নি। তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি ২০০২ এর আগস্টে রেডফোর্ডের দুর্গ প্রাকার থেকে ঘোষণা করেছিলেন ২০২০ সালের মধ্যে ভারত উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে, যে কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। তার আগে ১৯৯৮ এ এইচ .ডি. দেবে গৌড়া ইন্ডিয়া ২০২০ প্রোগ্রামকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

ভালো মানুষদের সাথে মিলিত হবার অভিজ্ঞতা হচ্ছে নিজেকেই শিক্ষিত করে তোলা। আমার জীবনের বিভিন্ন স্তরে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের সাথে মিলিত হয়ে নিজের ধ্যানধারণাকে বিনিময় করার সুযোগ পাওয়ায় আমি সৌভাগ্যবান।

৭

একটা প্রতিযোগিতামূলক জাতির প্রতি

প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই জাতির উন্নয়ন সম্ভব। জ্ঞানের দ্বারাই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। টেকনোলজি এবং আবিষ্কারের মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জিত হয়।

ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী গ্রামে বসবাস করে। এটাই বৈজ্ঞানিক সমাজের জন্য প্রকৃত চ্যালেঞ্জ ; প্রযুক্তির ফলেই ৭৫০ মিলিয়ন মানুষের সমৃদ্ধি ঘটতে পারে। বিজ্ঞান আর টেকনোলজি পেশায় আমার পঞ্চাশ বছরের জীবনে আমি সব সময়ই বিশ্বাস করে এসেছি যে এই দুটো ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটলেই জাতির উন্নয়ন সম্ভব। তিনটা প্রধান ক্ষেত্রের প্রতি আমরা আলোকপাত করতে পারি। ক্ষেত্র তিনটি হলো ন্যানোটেকনোলজি,ই-গভার্ন্যান্স আর বায়ো ডিজেল। আবিষ্কারের জন্য অনুকূল পরিবেশ কেন রাষ্ট্রপতিভবন থেকে শুরু করা যাবে না?

জটিল আর নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রয়োজন বহু সংখ্যক বিশেষজ্ঞের মিলিত চিন্তাভাবনা। বিভিন্ন মতামত আর সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারা মিশনকে সফল করা সম্ভব। এই বিষয়ে তিনটি চমৎকার ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। একটা রাষ্ট্রপতিভবনে, আর একটা রাষ্ট্রপতি নিলমে, অন্যটি সেকান্দ্রাবাদের রাষ্ট্রপতির অবসর ভবনে। এইসব স্থানে ন্যানোটেক্‌নোলজি, ই-গভার্ন্যান্স এবং বায়োডিজেল কনফারেন্স হয়েছিল। দেশের ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য এই কনফারেন্সগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আমি বেঙ্গালুরের জওহরলাল নেহেরু সেন্টার ফর এডভান্সড সায়েন্টিফিক রিসার্চের অনারারী প্রেসিডেন্ট প্রফেসর সি.এন.আর রাও এর সঙ্গে আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। ন্যানো সায়েন্স টেকনোলজির ভবিষ্যত উন্নয়ন ও রিচার্স এবং কৃষি, ওষুধ, মহাকাশ আর এনার্জির ভবিষ্যত উন্নয়ন সম্পর্কে ভারতীয় আর বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সাথে আমি অনেক আলোচনা করেছিলাম। এইসব আলোচনা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি রাষ্ট্রপতিভবনে সারাদিন ব্যাপী আলোচনার

ব্যবস্থা করলাম। আলোচনা থেকে পাওয়া সুপারিশের ভিত্তিতে ১০০০ কোটি রুপির সমন্বিত প্রোগ্রামের পরিকল্পনা করা হলো। প্রোগ্রামটাতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কথা ছিল। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি উৎপাদনের একটা সিম্পল মেথড গ্রহণ করেছে যেনে আমি আনন্দিত হলাম। কার্বন ন্যানো- টিউব ফিল্টারস সক্রিয়ভাবে পানি থেকে মাইক্রো-টু ন্যানো-স্কেল কনটামিন্যান্টস এবং পেট্রোলিয়াম থেকে হেভি হাইড্রোকার্বনস অপসারণ করতে পারে। প্রাইভেট কোম্পানী ডাবর এর অংশীদারিত্বে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণ সফলতার সাথে একটা ওষুধের উন্নয়ন সাধন করেন যা টিউমার সেলের উপর কার্যকর।

ভারতের উন্নয়ন আর জ্ঞানী সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব শর্ত হচ্ছে উপযুক্ত, সফল, স্বচ্ছ সরকার। ভারতের উন্নয়নের জন্য গ্রাম, জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে সমন্বিতভাবে বিকেন্দ্রীয় করা একান্ত প্রয়োজন। প্রাইভেট আর পাবলিক সেক্টরের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত পরিকল্পনা সমূহ বাস্তবায়ন করা। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি সমূহের অংশ গ্রহণে একটা ই-গভার্ন্যান্স কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল। আমরাও রাষ্ট্রপতিভবনে ই-গভার্ন্যান্স সিস্টেম চালু করেছিলাম। আমি এই বিষয়ের উপর জুডিশিয়ারী, অডিট এজেন্সি ও অন্যান্য সেক্টরের সভায় ভাষণ দিয়েছিলাম। কমনওয়েলথ মিটিংয়েও এই বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছিল। আমি আশা করেছিলাম ই-গভার্ন্যান্স এর সাহায্যে প্রত্যেক নাগরিককে পরিচয়পত্র পদান করা সম্ভব। ফলে উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীদের সাথে আমাদের লড়াই করা সহজ হবে।

আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে পানি ও এনার্জি এই দুটো বিষয়ে সংকট দেখা দেবে। গভর্নরদের কনফারেন্সের ভাষণে আমি জাতীয় ও রাষ্ট্র পর্যায়ে পানি সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের উপর জোর দিয়েছিলাম। অপর বিষয়টা ছিল এনার্জি সমস্যা। আমি বায়োগ্যাস এর উন্নয়নের জন্য বিশেষ নজর দেবার জন্য বলেছিলাম। এই উপলক্ষ্যে সচেতনা বৃদ্ধির জন্য আমি রাষ্ট্রপতি নিলম-এ একটা সমন্বিত কনফারেন্সের আয়োজনও করেছিলাম। এই কনফারেন্সে অভিজ্ঞ কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলররা এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। বায়োফুয়েল উৎপাদনের জন্য অকৃষি জমি বরাদ্দের কথা বলা হয়েছিল। কনফারেন্স শেষে সুপারিসমালা সংশ্লিষ্ট পক্ষের

কাছে বিলি করা হয়। বায়োফুয়েল পলিসির কথা উপস্থাপিত হওয়ায় আমি খুশি হয়েছিলাম।

এই তিনটি কনফারেন্স ছাড়াও রাষ্ট্রপতিভবন থেকে আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল।

≈

২০০৬ এ তৎকালীন **আইএসআরও** এর চেয়ারম্যান চাঁদে অভিযান চালানোর জন্য চন্দ্রায়ন মিশন নামে চন্দ্রাভিযানের পরিকল্পনার কথা আমাকে জানিয়েছিলেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম এটাই হবে প্লানেটারি অভিযানের প্রথম ধাপ। প্রস্তাবিত চন্দ্রাভিযান সম্পর্কে তিনি আমাকে বলেছিলেন চাঁদের রাসায়নিক, খনিজ ও প্রাণীজ সম্পদের অস্তিত্ব আছে। তিনি আমাকে আরো বলেছিলেন যে এই মিশন বহুবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বহন করে নিয়ে যাবে। **আইএসআরও** এ বিষয়টা চূড়ান্ত করার কাজ চলছে। আমি আমার মন্তব্যে বলেছিলাম চন্দ্রাভিযানের জন্য একটা সমন্বিত এন্ট্রি প্যাকেজ গ্রহণ করা যেতে পারে কমপক্ষে একটি টেলিমেট্রি চ্যানেল সংযোজন করে যার সাহায্যে চাঁদের ডেনসিটি কিংবা প্রেসার পরিমাপ করা সম্ভব হবে। চেয়ারম্যান তা করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই পরিকল্পনার ফল হিসাবে ২০০৮ এর ১৪ নভেম্বর চন্দ্রায়ন মিশনের অংশ হিসাবে চাঁদের পূর্ব নির্ধারিত মাটিতে ভারতের যান নেমেছিল। আমি এতে খুবই উল্লসিত হয়েছিলাম। এই সুন্দর অভিযানের জন্য আমি **আইএসআরও** কে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম।

≈

আমি ২০১১ এর গ্লোবাল ইনোভেশন রিপোর্ট পড়ে দেখলাম যে গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স র‍্যাংক সুইজারল্যান্ড ১, সুইডেন ২, সিঙ্গাপুর ৩, হংকং ৪, আর ভারত ৬২। ইনোভেশন ইনডেক্স এবং কমপিটেটিভ্‌নেস এর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। ২০১০-১১ এ ভারতের ইনোভেশন ইনডেক্স র‍্যাংক ৬২, আর অন্যদিকে গ্লোবাল কমপিটেটিভ্‌নেস র‍্যাংক ৫৬। যদি ভারতকে উন্নত দেশের পর্যায়ে (টপ ১০)পৌছাতে হয় তবে কমপিটেটিভ্‌নেস বৃদ্ধি করা একান্ত

প্রয়োজন। আমাদেরকে দেশীয় ডিজাইন ক্যাপাবিলিটি গড়ে তোলাও একান্তভাবে দরকার। টেকনোলজিগুলোর উন্নতি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর পেটেন্ট ভিত্তিক হওয়ায় দশ থেকে পনেরো বছর আগে বর্তমান গ্রোথ অর্জিত হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সর্বশেষ ফল উন্নত দেশ থেকে ভারতে সহজলভ্য হতে কমপক্ষে এক দশক লাগবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রিচার্স একান্ত জরুরি বিশেষ করে ব্যাসিক সায়েন্স এ যদি ভারতকে গ্লোবাল কমপিটেটিভ্নেস স্তরে পৌছাতে হয়। ভারতকে উন্নত দেশের পর্যায়ে পৌছাতে হলে আমি নিচে একটা লক্ষ্যমাত্রার কথা তুলে ধরবো।

≈

আমরা সম্প্রতি একটা মাইলফলক অতিক্রম করলাম। ২০১২ এর ১৯ এপ্রিল উড়িষ্যা উপকূলের উৎক্ষেপন এলাকা হুইলার আইল্যান্ডে ৫০ টন, ১৭.৫ মিটার উচ্চ অগ্নি ভি মিসাইল উৎক্ষেপন করা সম্পর্কে আমরা দু:চিন্তার মাঝে ছিলাম। মিসাইলটিতে উল্লম্বভাবে স্থাপন করে উৎক্ষেপনের আগে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরুর শেষে সকাল ৮.০৭ থেকে কাউন্ট ডাউন শুরু করা হলো। বিশাল একটা আগুনের গোলক মিসাইল থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র প্রথমে মিসাইলের মঞ্চে আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে অগ্নি ভি উৎক্ষেপন মঞ্চ ছেড়ে সুন্দরভাবে উপরের দিকে ধাবিত হলো। বিজ্ঞানীরা উৎক্ষেপন লক্ষ্য করলেন। তাদের মুখে কোন কথা ছিল না। দর্শকদের মনে টেনশন অবশ্যই ছিল। ৯০ সেকেন্ড পরে প্রথম স্টেজ পুড়ে গিয়ে আলাদা হয়ে গেল। মিসাইলটি সঠিক গতিবেগ পেল। তারপর পরিকল্পনা মাফিক দ্বিতীয় স্টেজটি পুড়ে গিয়ে পৃথক হয়ে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে মিসাইলটি ২০০০ কিলোমিটার গতিতে চলতে লাগলো যে পর্যন্ত না ইকুইডোর পার হোল। তারপর ৩০০০ কিলোমিটার গতিবেগে মকরক্রান্তি ছাড়িয়ে বায়ুমন্ডলে পুনরায় প্রবেশ করে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে পতিত হলো। উৎক্ষেপন থেকে ভূপাতিত হতে বিশ মিনিট সময় লাগলো। ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজগুলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মিসাইলের প্রতি নজরদারী করেছিল।

১৯৮৩ এ আইজিএমডিপি ৪০০ কোটি রুপি বরাদ্দ দিয়েছিল। এই প্রোগ্রামের আওতায় চারটি মিসাইল উৎক্ষেপন করে। মিসাইল চারটি হলো :

ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপক মিশাইল (পৃথ্বি), মাঝারি পাল্লার ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপক মিশাইল (আকাশ),স্বল্প পাল্লার দ্রুতগতি সম্পন্ন ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপক মিশাইল (ত্রিশূল), আর অন্যটি ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মিশাইল (নাগ), এছাড়াও টেকনোলজি ডেমোনেস্ট্রেশন মিসাইল (অগ্নি) এই প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৮৯ এর মে তে উড়িষ্যায় প্রথম এই টেকনোলজির ব্যবহার করে। চূড়ান্তভাবে *ডিআরডিও* এর বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়াররা অগ্নি ৫ উড্ডোয়নের সুযোগ সুবিধা দেয়। এই মিসাইলটির গতিবেগ ৫০০০ কিলোমিটার। এই মিসাইলগুলো **এমটিসিআর** (মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রিজিম) এবং অন্যান্য বিভাগ এর আওতায় ছিল। অগ্নি ৫ মিসাইলের সফল পরীক্ষা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার বন্ধু ড. ভি. কে. সারাওয়াত এবং তার দলবল অগ্নি ৫ উৎক্ষেপন সম্বন্ধে আমাকে জ্ঞাত করান।

এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিবেন। ১৯৮৪ এর একটা আলোচনা এবং ১৯৯১ এর অন্য একটা ঘটনার কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি। আমি হায়দ্রাবাদের **ডিআরডিএল** এর ডিরেক্টর ছিলাম। ১৯৮৩ এ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার ক্যাবিনেটের মাধ্যমে **আইজিএমডিপি** বরাদ্দ দেন ও তা থেকেই **ডিআরডিএল** গঠিত হয়। পরের বছর এই প্রোগ্রামের রিভিউ করা হয়। আমরা যখন প্রোগ্রামের অগ্রগতি উপস্থাপন করছিলাম তখন ইন্দিরা গান্ধী কনফারেন্স রুমে ওয়ার্ল্ড ম্যাপ দেখছিলেন। তিনি আমাদেরকে উপস্থাপনা বন্ধ রেখে ওয়ার্ল্ড ম্যাপের দিকে মনোযোগ দিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি আমাকে বললেন, কালাম, ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে দেখ, আর দূরত্বটাও দেখ। (তিনি ভারত থেকে ৫০০০ কিলো মিটার দূরের একটা জায়গা নির্দেশ করলেন।) অবশ্য এখন আমাদের **ডিআরডিও** মহান দেশনেত্রীর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে পেরেছে।

বস্তুতপক্ষে, যখন পৃথ্বি সঠিকভাবে উৎক্ষিপ্ত হলো তখন সেনাবাহিনী একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার কথা জানালো। আর্মি চাচ্ছিল ল্যান্ডরেঞ্জে একটা কনফার্মিট্রি টেস্ট করাতে। আমাদের মরুভূমিতে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে জিওপলিটিক্যাল সমস্যা দেখা দিল। এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আমাদেরকে পূর্বাঞ্চলের উপকূলে জনবসতিহীন একটা দ্বীপ খুঁজতে হলো। নৌবাহিনী হাইড্রোগ্রাফিক ম্যাপ সরবরাহ করলো। আমরা ম্যাপে বঙ্গোপসাগরের মাঝে কয়েকটা দ্বীপ ধর্মা (উড়িষ্যা উপকূলে) দেখতে পেলাম। আমাদের রেঞ্জ

টিমের এস, কে. সালবান এবং ড. ভি. কে.সারাস্বত ধর্মা থেকে একটা নৌকা ভাড়া করে দ্বীপটির সন্ধানে বের হলেন। ম্যাপে এই দ্বীপগুলো 'লং হুইলার', 'কোকনাট হুইলার' নামে পরিচিত। টিমটি একটা ডিরেকশনাল কম্পাস সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল। তারা পথ হারিয়ে ফেলায় হুইলার দ্বীপটির অবস্থান নিরুপণ করতে ব্যর্থ হন। সৌভাগ্যক্রমে, তারা কয়েকটা জেলে নৌকার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের কাছে হুইলার দ্বীপের পথটা সম্বন্ধে জানতে চাইলে তারা বললো যে তারা হুইলার দ্বীপ চেনে না, তবে ওদিকটাতে 'চন্দ্রচূড় নামে একটা দ্বীপ আছে। তারা ভাবলেন যে দ্বীপটা তারা খুঁজছেন ওটা সেই দ্বীপও হতে পারে। জেলেদের কথা মতো চন্দ্রচূড় দ্বীপের দিকে যাত্রা করলেন। জেলেদের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের টিমটি চন্দ্রচূড় দ্বীপে পৌছে গেলো। পরে তারা নিশ্চিত হলেন যে এই ছোট্ট দ্বীপটিই হুইলার। দ্বীপটিতে রেঞ্জ অপারেশন চালানো সম্ভব তারা ভেবে দেখলেন।

দ্বীপটি পাবার পর, আমরা উড়িষ্যা সরকারের স্মরণাপন্ন হলাম। চিফ মিনিস্টারের (১৯৩০)অনুমতি প্রয়োজন। ওই সময় বিজু পট নায়েক ছিলেন শক্তিশালী নেতা। তিনিই ছিলেন উড়িষ্যার মুখ্য মন্ত্রী। তার কাছ থেকে মতামত এলো কয়েকটি কারণে দ্বীপটি উড়িষ্যা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যা হোক, আমাদের অনুরোধে পটনায়কের সাথে মিলিত হবার ব্যবস্থা হলো। আমরা যখন তার অফিসে পৌছালাম তখন তার সামনেই ফাইলটা ছিল। সিএম আমাকে বললেন, 'কালাম, আমি বিনামূল্যে পাঁচটা দ্বীপ তোমাকে দিলাম। (ডিআরডিও), যখন তুমি আমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করবে তখনই আমি ফাইলে সই করে দেব।' তিনি আমার হাতটা ধরে বললেন, 'তোমাকে একটা মিসাইল তৈরি করতে হবে, যা দূরবর্তী স্থানের ভয় থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে।' আমি জবাবে বললাম, 'স্যার, আমরা এ কাজটা করবোই।' আমি তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টা আমাদের ডিফেন্স মিনিস্টারকে জানালাম। চিফ মিনিস্টার ফাইলে সই করে দিলেন। ছোট্ট হুইলার দ্বীপটি আমরা পেলাম।

≈

পাঠকদেরকে জানাতে চাই ২০১২ এর ২৬ এপ্রিল **আইএসআরও** সফলতার সাথে প্রথম রাডার ইমেজিং স্যাটেলাইট (**আরআইএসএটি-১**) উৎক্ষেপন করে। শ্রীহরিকোটা সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভিইকল (**পিএসএলভি-সি১৯**) উৎক্ষেপন করা হয়। স্যাটেলাইটকে মহাকাশের কক্ষ পথে পাঠানোর জন্য **আরআইএসএটি-১**) এর সি ব্যান্ড সিন্থেটিক অ্যাপেচার রাডার এর সোলার প্যানেল ও এন্টিনা প্যানেল সফলভাবে স্থাপন করা হয়েছিল। এছাড়াও একগুচ্ছ ফোর অরবিট-রেইজিং ম্যানোভার এর মাধ্যমে সফলভাবে পোলার সান সিনক্রোনাস অরবিট এ স্যাটেলাইটকে স্থাপন করা হয়। গঙ্গোত্রি থেকে গুণগত মানের ছবি পাঠাতে শুরু হয় ভোপাল এবং উত্তর কর্ণাটক ছাড়িয়েও ২০১২ এর ১ মে হতে।

মিশন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে সক্ষম হয় আমি সংক্ষেপে তার কথা বলতে চাই। (**আরআইএসএটি-১**)

সিন্থেটিক অ্যাপেচার রাডার ভূপৃষ্ঠের ছবি র‌্যাডারের মাধ্যমে পাঠাতে শুরু করে। এর ফলে সূর্যের আলো ছাড়াও মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থাকলেও ছবি পাবার সুযোগ সৃষ্টি হলো। **আরআইএসএটি-১** এর বহুমুখী কাজের ফলে ইমেজিং রেজুলেশন হলো ১ থেকে ৫০ মিটার অন্যদিকে কভারেজ এরিয়া হলো ১০ কিলোমিটার থেকে ২২৩ কিলোমিটার। **আরআইএসএটি-১** এর গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে ছিল কৃষি বিভাগের ধান,খরিফ শষ্যসহ বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রের ম্যাপ তৈরি করা। বন্যা, সাইক্লোন এর দুযোগের পূর্বাভাষ দিতেও **আরআইএসএটি-১** কার্যক্ষমতা বিশাল। এছাড়াও **আরআইএসএটি-১** এর কার্যক্রম বিবিধ।

এইসব সফলতার ফলে আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। আমি এছাড়াও বহুবিধ সফলতার খতিয়ান দিতে পারি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আংশিক মেঘলা দিনে নৌবাহিনীর বেঙ্গালুরুর লাইট কম্বাট এয়ারক্রাফট (**এলসিএ**)এর সাফল্যের কথা। **এলসিএ** এর প্রথম ফ্লাইট ছিল সফল। ভারত 'স্কি টেক অব বাট এ্যারেস্টেড রিকোভারী' (**এসটিওবিআর**) মাধ্যমে ডিজাইনিং, ডেভেলপিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, টেস্টিং এর ফোর্থ জেনারেশন ক্যারিয়ার বোর্ন ফ্লাই এর দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে এলিট ক্লাবে যোগদানের মর্যাদা লাভ করলো। নৌবাহিনী প্রথম চেষ্টা করে স্বয়ং সম্পূর্ণ মেরিন ফোর্স হিসাবে গড়ে উঠতে যাতে একুশ শতকে ভারতীয় নৌবাহিনী যুদ্ধের নিপুণ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে।

ইনফরমেশন টেকনোলজি আর কমুনিকেশন টেকনোলজির মাঝেই চরম উন্নতি অর্জন করতে পেরেছে। ইনফরমেশন টেকনোলজি ও বাইয়োটেক্নোলজির মেলবন্ধনে বায়ো-ইনফরমাটিক সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে, ফটোনিক্স ল্যাব থেকে ক্লাসিকাল ইলেক্ট্রোনিকস ও মাইক্রোইলেক্ট্রোনিকসে পৌঁছে গেছে। ভোক্তাদের কাছে তা নতুন মাত্রা পেয়েছে। এখন ন্যানোটেক্নোলজির যাত্রা শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে মেডিসিন, ইলেক্ট্রোনিকস আর ম্যাটারিয়াল সায়েন্সে নতুন যুগের সূচনা হবে।

যখন ন্যানোটেকনোলজি আর আইসিটি একসাথে মিলিত হয়ে সিলিকন,ইলেক্ট্রোনিক,ফটোনিক্স পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হবে। এ থেকে বলা যেতে পারে যে ম্যাটারিয়াল কনভার্জেন্স ঘটবে। ম্যাটারিয়াল কনভার্জেন্স আর বায়োটেক্নোলজি একত্রিত হয়ে একটা নতুন বিজ্ঞানের সৃজন হবে, যাকে বলা যেতে পারবে ইনটেলিজেন্ট সায়েন্স। বায়োসায়েন্সের সৃজনের ফলে রোগমুক্ত সমাজের উদ্ভব ঘটবে, আর এর ফলে মানুষ দীর্ঘজীবী হবার ক্ষমতা অর্জন করবে।

কনভার্জেন্স অব সায়েন্স হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্কিত। আমাকে একটা উদাহরণ দেবার অনুমতি দিতে পারেন। সম্প্রতি, আমি হার্ভাড ইউনির্ভাসিটিতে ছিলাম। সেখানে আমি ল্যাবরেটোরিগুলো পরিদর্শন করি। ওখানে হার্ভাড স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অ্যাপলায়েড সায়েন্স থেকে আসা বহু প্রখ্যাত প্রফেসরদের সাথে আমি মিলিত হই। আমার স্মরণ আছে প্রফেসর হংকুন পার্ক আমাকে দেখান তার আবিষ্কৃত ন্যানো নিডিলস, যা কারো স্থিরিকৃত সেলগুলো প্রবেশ করতে পারে ওষুধ ঢুকানোর জন্য। ওইটা হচ্ছে ন্যানোপার্টিকেল সায়েন্স যা বায়োসায়েন্সের সাথে সম্পর্কিত। তারপর আমি প্রফেসর বিনোদ মনোহরণ এর সাথে মিলিত হই, তিনি আমাকে প্রদর্শন করেন কিভাবে বায়োসায়েন্স ন্যানোম্যাটারিয়ালে রূপ নেয়। তিনি ডিএনএ ম্যাটারিয়ালকে ব্যবহার করে সেল্ফ অ্যাসেম্বলিং পার্টিকেলস এর ডিজাইন আমাকে দেখান। যখন একটা নির্দিষ্ট ধরনের ডিএনএ একটা পার্টিকেলে এটোমিক লেভেলে প্রয়োগ করা হয় তখন তা থেকে পূর্ব নির্ধারিত আচরণ প্রকাশ পেয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিলিত হয়। এটাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিলিত হবার ডিভাইস হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। মধ্য মহাকাশে মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই কলোনি গড়ার ডিভাইস হতে পারে এটা, যা ড. কে. এরিক ড্রেক্সলার এর বিবেচিত বিষয়। আমি দেখতে পেলাম কিভাবে

দুটো পৃথক সায়েন্স একে অপরের সাথে মিলিত হতে পারে। বিজ্ঞানের পারস্পরিক মিলিত শক্তির ভবিষ্যত আমাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে।

পরিশেষে বলতে হয়, টেকসই পদ্ধতিগুলো আমাদের উন্নতির জন্য কার্যকর হবে, পদ্ধতিগুলোর মধ্যে টেকনোলজির ভূমিকাই হবে সবচেয়ে প্রধান। এটা হবে একুশ শতাব্দীর জ্ঞানভিত্তিক সমাজের নতুন দিকদর্শন। সে সময় বিজ্ঞান, টেকনোলজি আর পরিবেশ এক সাথে মিলে মিশে অবশ্যই কাজ করবে। এভাবেই বায়ো-ন্যানো-ইনফো-ইকো এই চারটি দিকদর্শন ভিত্তিক নতুন যুগের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে।

আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পছন্দ করি আপনার কি এসব পছন্দ করতে মনে লাগে? আপনার এ বিষয়ে লেখা উচিত। তা হতে পারে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান, একটা আবিষ্কার, একটা উদ্ভাবন কিংবা একটা পরিবর্তন যা আপনি সমাজকে দিতে পারেন যার জন্য জাতি আপনাকে মনে রাখবে।

৮

মোমবাতি ও মথ

বাতিগুলো নানা রকমের
কিন্তু আলো একইরকমের।
পার্থিব আনন্দগুলো তুমি পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিলে,
তুমি আমার অন্তরাত্মার মাঝে থাকবে।

১৯৯৯ এর ১১ জানুয়ারি এয়ারবোর্ণ সার্ভিলল্যান্স প্লাটফরম বিধ্বস্ত হওয়ায় আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। বিধ্বস্ত প্লাটফরমের অংশ বিশেষ আমি বাড়ি নিয়ে এলাম। এই পরীক্ষা সম্বন্ধে আমার বন্ধু প্রফেসর অরুণ তেওয়ারির সাথে আলাপ আলোচনা করে আমার আবেগ ব্যক্ত করলাম। অরুণ তেওয়ারি (এটি) : জীবনের প্রয়োজনীয় ইস্যুগুলো স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে পরিবর্তন আর খারাপ ঘটনার সময়ে। আত্মদর্শনের মাধ্যমে তাদের উদ্ভব ঘটে। তারা বিশেষভাবে আত্মার মধ্যে প্রবেশ .করে। ফ্রানজ কাফকা তার মাস্টারপিস'মেটামোরফোসিস'এ এই অনুষঙ্গই তুলে ধরেছেন।

এপিজে : আমি ওটা দেখতে পাই। প্রথম ফ্লাইট এসএলভি -৩ এর ব্যর্থতা এবং অগ্নির উৎক্ষেপনের প্রাক অসুবিধাগুলোর মধ্য থেকে নিজেকে আবিষ্কার করতে হবে। ১৯৯৯ এ আরাকোনাম বিধ্বস্ত হওয়ায় আমার অতি খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার অহম বোধ চুরমার হয়ে গেছে।

এটি : ওই কথা আপনি আর বলবেন না। আমি শুধুমাত্র প্রচণ্ড ব্যথার আইসবার্গটাই দেখতে পাই। আপনাকে কাজের সমুদ্রে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে হবে। আপনি কি আমার সাথে থাকবেন?

এপিজে : সাথে থাকার চেয়েও আমি বেশি কিছু করতে পারি। আমি আটজন তরুণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই। বৈজ্ঞানিক কাজে তারা তাদের জীবনদান করেছেন। জাতি অবশ্যই ওই সব বীরদের কথা মনে রাখবে। আমি তাদের পরিবারগুলোর সাথে কষ্ট ভাগাভাগি করতে চাই।

এটি : জনাব, ১১ জানুয়ারির এয়ারবোর্ণ সার্ভিলল্যান্স প্লাটফরম(এএসপি) বিধ্বস্ত হওয়ার কথা বলছেন।

এপিজে : হ্যাঁ, এএসপি আরাকোনামের কাছের জঙ্গলে বিধ্বস্ত হয়।

এটি : আমি একবার কে. রামচন্দ এর কাছে এই দুর্ঘটনার কথা বলেছিলাম। তিনি সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে এয়ারবোর্ণ সার্ভিলল্যান্স প্লাটফরম সিস্টেমের অভ্র এয়ারক্রাফট উড়ে ছিল ১৪০০ ঘন্টা, ১০,০০০ ফিট উপর দিয়ে চেন্নাই উপকূলের দিকে যাচ্ছিল। আরাকোনাম... চেন্নাই উপকূল ধরে যখন উড়ছিল তখন তা রাডারের আওতার বাইরে চলে যায়। মিশন ট্রায়েলের জন্য টার্গেট এয়ারক্রাফট এএন ৩২ অভ্রের উড্ডয়নের ১৫ মিনিট আগে উড়ে ছিল। রাডার সমুদ্র আর উপকূল এলাকাতে অনুসন্ধান চালিয়েছিল। রাডার ভিএইচএফ (ভেরি হাই ফ্রিকুয়েন্সি) এর মাধ্যমে খোঁজাখুঁজি চালিয়ে গিয়েছিল। দেড় ঘন্টা ফ্লাইট টেস্টিং এর পর টার্গেট এয়ারক্রাফট ১৬০০ ঘন্টা পরে আরাকোনাম অবতরণ করেছিল। বস্তুতপক্ষে, এএসপি এয়ারক্রাফ্‌ট চেন্নাই থেকে আরকোনামের দিকে উড়ে ১০,০০০ ফিট থেকে ৫,০০০ ফুট নেমে এসেছিল। যখন এয়ারক্রাফট এয়ার ফিল্ড থেকে প্রায় পাঁচ নটিক্যাল মাইল দূরে ৩০০০ ফুট এবং ৫০০০ ফুট উপর দিয়ে উড়েছিল। এয়ারক্রাফ্‌ট এক পর্যায়ে চলার শক্তি হারিয়ে বিধ্বস্ত হয়। এয়ারক্রাফ্‌টের আটজনই নিহত হন।

এপিজে : আমি সাউথ ব্লকে ডিফেন্স কাউন্সিলে মিটিং এ ছিলাম সে সময় আমাকে এয়ার ক্রাফ্‌ট বিধ্বস্ত হবার খবর জানানো হয়। আমি শোকাহত পরিবারগুলোকে শান্তনা জানানোর জন্য বেঙ্গালুরে ছুটে গেলাম। এয়ার মার্শাল এ. ওয়াই. টিপনিসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সময়টা ছিল বেদনাদায়ক। যুবতী পত্নীদের কান্না আর শোকে নির্বাক হয়ে যাওয়া পিতামাতা দাঁড়িয়েছিলেন। একটা ভদ্রমহিলা তার শিশুটিকে আমার কোলে দিয়ে বললেন, ‘ওকে কে দেখবে?” অপর একটি ভদ্র মহিলা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললেন, ‘কেন আপনি এটা করলেন, মি.কালাম?’

এটি : রামচাঁদ আমাকে নিহত অফিসারদের তালিকা দিলেন। স্কোয়ার্ডন লিডার পি. ভেঙ্কটারমন এয়ারক্রাফ্‌টের পাইলট, পি. ম্লাঙ্গো ছিলেন ইন্সট্রুমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ার, আর ছিলেন এয়ারবোর্ণ সিস্টেমের (সিএবিএস) রাডার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার কে. পি. শাজু, রাডার প্রোসেসিং বিজ্ঞানী ডি. নরসীমাস্বামী এবং ইলেকট্রোনিক রিচার্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইস্টাবলিশমেন্ট (**এলআরডিই**) এর সিগন্যাল প্রোসেসিং বিজ্ঞানী আই.জয়াকুমার এবং স্কোয়ার্ডন লিডার এন. ভি. সেশু, আর. ভাটনগর, এয়ার ফোর্সের অন্য এক অফিসার এস. রবি এর নাম নিহত অফিসারদের তালিকায় ছিল।

এপিজে : সবাই পরিবারগুলোকে শান্তনা দিলেন। কর্তৃপক্ষ কফিন তৈরি করে সেগুলোতে ভর্তি করে লাশগুলোকে কমুনিটি হল এ রাখলো।

এটি : ওহ্ হায় ঈশ্বর!

এপিজে : আমার রাজ্যে শোকের ছায়া নেমে এলো। আমি তাদের শেষ বিদায় জানানোর অনুষ্ঠানের ভাষণে আমি মাত্র দু'একটা কথা বললাম।

এটি : আমার মনে পড়ে সিভিল ওয়ারে জীবন উৎসর্গ কৃত পাঁচ পুত্রের জননীর উদ্দেশ্যে লেখা আব্রাহাম লিংকনের চিঠির কথা।

আমি অনুভব করি এত বড় ক্ষতিতে দু:খ আর শোকে হৃদয় বিদীর্ণ মায়ের কাছে আমি কেমন করে শান্তনার বাণী শোনাবো। তবুও আমি আপনাকে শান্তনা না জানিয়ে থাকতে পারি না। দেশকে রক্ষা করার জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করেছেন সে জন্য প্রজাতন্ত্র তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

আমি স্বর্গীয় পিতার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনাকে শোক সহ্য করার ক্ষমতা প্রদান করেন। তিনি যেন আপনাকে ভালোবাসা আর হারানোর স্মৃতিকে বুকে গেঁথে রাখার শক্তি দেন। তাদের আত্মত্যাগ স্বাধীনতার বেদীমূলে উৎসর্গিত হবার জন্য আমরা সর্বান্তকরণে গর্বিত।

এপিজে : বিলাপরত বিধবারা, শোকে পাথর হওয়া পিতামাতা, আমার কোলে দেওয়া নিস্পাপ শিশুটি আর কফিনে রাখা ভাগ্যহতদের মৃতদেহগুলোর কথা রাষ্ট্রপতিভবনে বসে থাকাকালেও আমার মনকে বিদীর্ণ করতো। রাজনীতি ও প্রোটকলের বেড়াজালের মাঝেও ব্যথা ও বেদনা আমার হৃদয়কে ব্যথিত করে। ল্যাবরেটোরি ও কর্মক্ষেত্র থেকে কি জনগণের ভোগান্তিকে দূর করতে পারি?

এটি : আপনার ম্যাসেজটা কী?

এপিজে : একটা মথ হয়ে একটা মোমবাতি হবার ভান করো না। সেবা করার গুপ্তশক্তিকে জানো। রাজনীতির বহিরাবরণ জাতি গঠনের চালিকাশক্তি এই কথাটা আমাদের কাছে ভুল বলে মনে হয়। আত্মোৎসর্গ, কঠোর পরিশ্রম, শৌর্যবীর্য প্রদর্শনই কদাচিৎ সত্যিকারের একটা জাতি গঠনের চালিকা শক্তি হতে পারে।

এয়ারবোর্ণ সার্ভিলল্যান্স প্লাটফরম বিধ্বস্ত হওয়া আমার জীবনের অন্যতম মর্মান্তিক ঘটনা। আমি এই সংলাপের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছি আমি কত গভীরভাবে এই বেদনাকে অনুভব করি। আমি আরো জানাতে চাই যে জটিল মিশনগুলোর যাত্রাপথ দীর্ঘ এবং কঠিন। এ ধরনের ব্যর্থতাও কিন্তু আমাদেরকে সেবার মনোভাব জাগ্রত করে।

৯

আমার গুজরাট সফর

দেবদূত তার জ্ঞানের জন্য বন্ধনমুক্ত,
পশু কারণ সে অজ্ঞ,
এই দুইয়ের মধ্যে মানুষের পুত্র লড়াই করে টিকে থাকে।
– রুমি

উন্নয়নের স্তম্ভগুলোর সম্বন্ধে আমি প্রচুর ভেবেছি। জাতিকে গঠন করতে হলে দারিদ্রতাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা এবং নিরক্ষতাকে দুর করা একান্ত প্রয়োজন। সাথে সাথে এমন একটা সমাজ গড়তে হবে যেখানে নারী এবং শিশুদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সহিংসতা থাকবে না ও দেশের কেউই নিজেকে অসহায় ভাববে না। ২০০২ এর আগস্ট মাসে আমার গুজরাট সফরকালে এই ভাবনাগুলো আমার মাথায় আসে। আমি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমার প্রধান কাজ ছিল তাৎক্ষণিকভাবে গুজরাট সফর। কয়েক মাস আগে সংঘটিত দাঙ্গায় রাজ্যটিতে হাজার হাজার জীবনের উপর দুর্দশা নেমে আসে। কাজটা ছিল বড়ই স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ। আমি সিদ্ধান্ত নেই যে আমার মিশনটা হবে কী ঘটেছিল তার দিকে দৃষ্টিপাত না করা,কী ঘটছিল তাও না দেখা। কী করা উচিত তার প্রতি আমি আলোকপাত করতে চাই। যা ঘটেছিল তা নিয়ে এর মাঝেই জুডিশিয়ারি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পার্লামেন্টে আলোচনা চলছিল, এমনকি এখনো তা চলমান আছে।

এ ধরনের সংঘাতপূর্ণ অবস্থা চলা এলাকাতে কোন রাষ্ট্রপতির পক্ষে সেখানটা সফর করা কখনো সম্ভব নয়। খারাপ অবস্থা কবলিত এলাকাতে আমার সফর সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছিল। মিনিস্টিরি এবং আমলাতন্ত্র থেকে আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল আমি ওই অবস্থা কবলিত সময়ে গুজরাট রাজ্যে সফর যেন না করি। প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটা ছিল রাজনৈতিক। যা হোক,আমি মনস্থির

করলাম যে আমি সেখানে যাব। রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রথম সফরের প্রস্তুতি রাষ্ট্রপতিভবনে পুরোদস্তুর চলছিল।

প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী আমাকে শুধুমাত্র একটা প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি এই সময়ে গুজরাট সফর জরুরি?' আমি জবাবে পিএমকে বললাম, 'এটা আমার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাতে আমি দুঃখ বেদনাকে কিছুটা লাঘব করতে পারি, সেই সাথে রিলিফের কাজকেও গতিশীল করতে পারি। লোকজনদের মনে একতার বাণী পৌঁছে দেওয়াও আমার মিশনের লক্ষ্য। আমি আমার ভাষণে এই বাণীর উপরই জোর দেব।'

তাদের থেকে অনেক প্রকারের উদ্বেগ প্রকাশ পেল যে চিফ মিনিস্টার আমার সফরকে বয়কট করতেও পারেন। আমাকে শীতল অভ্যর্থনা দেওয়া হতে পারে এমনকি বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আমার সফরের প্রতিবাদও উত্থিত হতে পারে। আমি কিন্তু গান্ধীনগরে অবতরণ করে বিস্মিত হলাম। বিমান বন্দরে শুধুমাত্র চিফ মিনিস্টারই উপস্থিত নন, পুরো ক্যাবিনেট, বিপুল সংখ্যক বিধান সভার সদস্য, অফিসিয়াল এবং জনসাধারণ বিমান বন্দরে উপস্থিত! আমি গুজরাটের বারটি এলাকা সফর করলাম। তিনটি রিলিফ ক্যাম্প এবং সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত নয়টা দাঙ্গা পীড়িত এলাকায় গেলাম। আমার সফরকালে চিফ মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী আমার সাথে ছিলেন। আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানেই তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন, আমি আবেদনপত্র ও অভিযোগপত্র গ্রহণ করার সময়ও তিনি আমার সাথে ছিলেন, আমি তাকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিলাম।

একটা দৃশ্যের কথা আমার মনে আছে, আমি একটা রিলিফ ক্যাম্প সফর করার সময় ছয় বছর বয়সী একটা ছেলে আমার কাছে এসে হাতজোড় করে আমাকে বলে, 'রাষ্ট্রপতিজী, আমি আমার বাবা মাকে চাই।' তার কথা শুনে আমি নির্বাক হয়ে পড়ি। এ ঘটনার পর আমি জেলা কালেক্টরদের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে একটা মিটিং করি। চিফ মিনিস্টার আমাকে আশ্বাস দেন যে সরকার থেকে বালকটির লেখাপড়া সহ তার কল্যাণের জন্য সব ব্যবস্থা করা হবে।

আহমেদাবাদ ও গান্ধীনগরে অবস্থান কালে সমাজের সকলস্তরের লোকজন আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে তাদের সমস্যাবলী ও মতামত জানানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করে। আহমেদাবাদে আমাকে ঘিরে প্রায় ২০০০ লোক সমবেত হয়।

আমার বক্তব্য আমার একজন বন্ধু গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করে তাদেরকে শোনান। আমাকে পঞ্চাশটি প্রশ্ন করা হয়। আমি তাদের কাছ থেকে ১৫০ টি আবেদন গ্রহণ করি।

আহমেদাবাদে দুটো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আমার সফর প্রকৃতপক্ষেই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, বিশেষ করে দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে। আমি অক্ষরধামে প্রামুখ স্বামীজী মহারাজের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে স্বাগত জানান। আমি তার সাথে মানুষের মনে একতাবদ্ধ হবার আকাঙ্খা জাগ্রত করার বিষয়ে আলোচনা করি। গুজরাটে মহাত্মা গান্ধী, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং বিক্রম সারাভাইর মতো মহান ব্যক্তিদের আদর্শ সমুন্নত রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও তার সাথে আলাপ কালে উঠে আসে। আমি সবরমতি আশ্রমও সফর করি। সেখানে আমি বহুসংখ্যক আশ্রমবাসীর সাথে মিলিত হই। তাদের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ লক্ষ্য করি। আমি সেখানে দেখতে পাই তারা তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম অভ্যাসবশত প্রয়োজনের খাতিরে করে চলেছেন। আমি অক্ষরধাম আশ্রমেও একই ধরনের উদ্বেগ আর আবেগ প্রত্যক্ষ করি। আমি ভেবে বিস্মিত হলাম কেন এমনটা উভয় আশ্রমেই দেখতে পেলাম। আমি উপলব্ধি করতে পারলাম, উভয় আশ্রমেই স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত আছে। তাদের আধ্যাত্মিক আবহের মধ্যে সমাজের প্রতি সুখ, শান্তি, প্রগতির অনুষঙ্গ বিরাজ করছিল। ফলে তারা তাদের চারপাশের বেদনাদায়ক পরিস্থিতিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি বলে আমার মনে হলো। আমি এই কথা বলছি এই কারণে আমাদের দেশ সভ্যতার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এই দেশে মহান মহান ব্যক্তিরা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন যারা বিশ্বে বিশেষ ভূমিকায় সর্বকালের জন্য সমাদৃত। তাদের দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটা নৈতিক অবক্ষয়ের পরিচয় বহন করে, যা কখনোই ঘটা উচিত নয়।

ব্যাপক সফরের ফলে আমার মনে শুধুমাত্র একটা ভাবনাই প্রথিত হলো যে বিশাল জনগোষ্ঠীর উন্নতির জন্য আমাদেরকে অনেক অনেক কাজ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করা। উন্নয়ন কি আমাদের একমাত্র এজেন্ডা হতে পারে না? যেকোন নাগরিকের মৌলিক অধিকার ভোগ করে সুখের মুখ দেখার প্রত্যাশা আছে। কোনো মানুষের মনের একতাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার অধিকার কারো নেই, কারণ একতা আমাদের দেশের মানুষের

মনে একসূত্রে গাঁথা। প্রকৃতপক্ষে,আমাদের দেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিচার কী, গণতন্ত্র কী? দেশের প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে সম্মানের সাথে বাঁচার; বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জীবন যাপনের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে। সঠিক বিচার-আচার, সুন্দর জীবন ধারণের মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের বাঁচার অধিকার আছে। সবার জন্য যথাযথ সম্মান আর বৈশিষ্ঠ্যমণ্ডিত জীবনের জন্য গণতন্ত্রের প্রয়োজন। সেই গণতন্ত্রের কথা আমাদের সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে। সহনশীলতা, সত্যবাদিতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রই।

আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের সবার জন্য প্রয়োজন মনে প্রাণে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করা। অন্যান্যদের প্রতি অসহনশীলতা হওয়া, ঘৃণা প্রকাশ করা,অপর ধর্মের মানুষের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন, আইন হাতে তুলে নেওয়া, মানুষের উপর উৎপীড়ন কোনক্রমেই ন্যায় সংগত হতে পারে না। আমাদের সবাইকে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে এবং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে সকলের অধিকারকে রক্ষা করতে হবে। এইগুলো রক্ষিত হলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের সভ্যতাভিত্তিক ঐতিহ্য ও আমাদের জাতির বিবেককে আমি বিশ্বাস করি।

আমি আমার দু'দিনের সফর শেষ করে আসার পর মিডিয়া আমার কাছ থেকে একটা ম্যাসেজ পাবার জন্য একটা প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করলো। আমি আমার চিন্তাভাবনা একজন মুখপাত্রের মাধ্যমে জানালাম যাতে আমি প্রকাশ করি জোরালো একটা আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য ধরনের হিংসা বিদ্বেষকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার লক্ষ্যে সকলের মধ্যে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার আছে তার নিজের ধর্ম, কৃষ্টি আর ভাষার প্রতি আস্থাবান হবার। আমরা কোনভাবেই কোন কিছুকে বিনষ্ট করতে পারি না।

১০

দেশে-বিদেশে

আমি একজন বিশ্ব নাগরিক,
প্রত্যেক নাগরিক আমার আত্মীয়স্বজন।

আমার পেশাগত জীবনের পুরো কালপর্বে সদাসর্বদা জাতীয় কাজে ব্যস্ত থাকায় আমার হাতে বিদেশ ভ্রমণ করার সুযোগ হয় নি। যা হোক,দেশের ফার্স্ট সিটিজেন হিসাবে ভারতে আসা রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে স্বাগত জানানো এবং তাদেরকে সরকারিভাবে সম্মানিত করাটাই নিয়ম। বিদেশি ডেলিগেটরা সফরে এলে তাদের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শনের জন্য রাষ্ট্রপতিভবনের উদ্দীপনাময় টিমের কাজ বেড়ে যায়। আমাকেও তাদের সফর সম্বন্ধে সবচেয়ে সচেতন থাকতে হয়েছিল। আমাদের উপকারের জন্য আমাদের যোগ্যতাকে তাদের সামনে তুলে ধরা কর্তব্য। এজন্য ওয়ার্ল্ড নলেজ প্লাটফরম এর ধারণা অর্জন করার প্রয়োজন ছিল। আমি এই জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশেষজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের সাথে আলোচনা করেছিলাম। আমরা সফরকারীদেরকে ভারতের আইটি, ই-গভার্ন্যান্স ও ফার্মাসিটিউক্যালের যোগ্যতা প্রদর্শন করতাম। আমি খুশি ছিলাম প্রত্যেকটা মিটিং এবং সফরে আমাদের দ্বিপাক্ষিক কিংবা বহুপাক্ষিক প্রকল্পের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আলোচনা হয়েছিল।

বিদেশে প্রত্যেকটা সফরই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুদান সফরকালে আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল দেশটির দক্ষিণ ভাগ রাজধানী খার্তুম থেকে একটা অয়েল পাইপলাইন স্থাপনের জন্য প্রায় এক বিলিয়ন ডলার মূল্যের চুক্তি সম্পর্কে। আজ সুদান থেকে পাইপলাইনের সাহায্যে তেল ভারতে আসছে। ইউক্রেনে একটা বড় ধরনের প্রোগ্রাম ছিল। এই সফরে মহাশূন্য সহায়তা সম্পর্কে আগাম কথাবার্তা হয়। যা হোক, আমি মাত্র কয়েকটা সফরের

সংক্ষিপ্তসার এখানে তুলে ধরবো। আমি ২০০৪ এর সেপ্টেম্বর এ সাউথ আফ্রিকা সফরে যাই। প্রেসিডেন্ট থাবো এমবেকি আমাকে প্যান আফ্রিকান পার্লামেন্টে ভাষণ দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। জোহান্সেবার্গে তিপান্নটি আফ্রিকান দেশ এখানে প্রতিনিধিত্ব করছিল। আমি আনন্দের সাথে তার অনুরোধ গ্রহণ করলাম। আমি আমার টিমের সাথে মিলিতভাবে আমার বক্তৃতার খসড়া করলাম। ওখানে তুলে ধরলাম ভারতের কোন কোন যোগ্যতার অংশীদার আফ্রিকান জাতিগুলোকে করতে পারি। ফলশ্রুতিতে আফ্রিকান জাতিগুলোর সাথে আমাদের একটা নেটওয়ার্ক গড়ে উঠলো। বারটা ইউনিভার্সিটি ও সতেরোটি বিশেষায়িত হাসপাতাল কে ভারত থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, এবং ই-গভার্ন্যান্স সেবা গ্রহণের প্রস্তাব দিল। প্রাথমিকভাবে বিশেষজ্ঞরা ই-গভার্ন্যান্স নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য ৫০ মিলিয়ন থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ের একটা এস্টিমেট প্রদান করলো। প্যান আফ্রিকান পার্লামেন্টে প্রস্তাব পাঠানোর আগে আমি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর কাছে ব্রিফ পেশ করলাম। তিনি অনুধাবন করলেন যে প্রস্তাবটাতে ভারত সম্পর্কে আফ্রিকায় একটা ফোকাস পড়বে এবং এর ফলে প্যান আফ্রিকান দেশগুলোর সাথে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্যান আফ্রিকান ই-নেটওয়ার্ক এখন একটা সুপ্রতিষ্ঠিত অর্জন। ভারত সরকার ২০০৯ এর ফেব্রুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সেবা উদ্বোধন করে। আজকের দিনে ই-নেটওয়ার্ক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্বশীল পরিসেবা হিসাবে বিবেচিত।

≈

আমার মনে পড়ে ২০০৬ এ ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট জোসেপ বোরেল ফন্টলেস রাষ্ট্রপতিভবনে আমার সাথে মিলিত হন। আমাদের আলোচনার প্রাক্কালে বিষয়টা সম্বন্ধে দীর্ঘক্ষণ তিনি আমার সাথে কথাবার্তা বলেন। বিষয়টা আমার মনে ধরে। ওই আলোচনাটা নাগরিকদেরকে আলোকিত করে গড়ে তোলা বিষয়ক ছিল। আমার ওয়েবসাইট থেকে বিষয়টা সম্বন্ধে তিনি অবগত হন। বিষয়টির উপর আমাকে তিনি অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। তার প্রশ্নগুলো চিন্তাভাবনায় পূর্ণ, গভীর আর কাজের ছিল। আমাদের আলোচনা

শেষে তিনি আমাকে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে ভাষণ দিতে আহ্বান জানান। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাতাশটি দেশের ৭৮৫ জন সদস্য এই পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তারা ছিলেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সরাসরি নির্বাচিত সদস্য। তিনি আমাকে বললেন তার প্রেসিডেন্টের মেয়াদ ২০০৬-এর ডিসেম্বরে শেষ হবে। একারণে তিনি ২০০৬ শেষ হবার আগেই বহু সংখ্যক কমিটমেন্ট রেখে যেতে চান। তিনি আরো জানালেন যে ২০০৭ এর এপ্রিল পর্যন্ত তিনি তার বক্তব্য শেষ করতে পারবেন না। ওই সময় ফন্টলেস এর কাছ থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন হান্স গার্ট - পোট্টারিং।

আমার ভাষণ টি ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমার সফরের আগেই আমি বিশেষভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ছিলাম বন্ধুবান্ধব, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিজ্ঞানী এবং তরুণদের সাথে মতবিনিময় করে। আমি এই উপলক্ষ্যে আমার লেখা 'ম্যাসেজ ফ্রম মাদার আর্থ' কবিতাটিকেও আমার ভাষণের মধ্যে সংযোজিত করেছিলাম। কবিতাটিতে প্রতিফলিত হয়েছিল ইউরোপিয়ান জাতির কথা, যার মধ্যে তারা একে অপরের সঙ্গে অনেক নিষ্ঠুর লড়াইয়ের কথা উঠে এসেছিল। আর তারাই সকল সদস্য রাষ্ট্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, সুখ শান্তির মাধ্যমে এক সময় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এটা অবশ্যই ওই এলাকার অগ্রযাত্রায় অনুপ্রেরণা স্বরূপ ছিল।

আমি ২৫ এপ্রিল সকালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পার্লামেন্টে পৌঁছালে প্রেসিডেন্ট ও তার সহকর্মীরা আমাকে স্বাগত জানালেন। ৭৮৫ জন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং কানায় কানায় ভরা ভিজিট'স গ্যালারী দেখে আমি আপ্লুত হলাম।

আমার ভাষণের শিরোনাম ছিল 'ডায়নামিকস অব ইউনিটি অব নেশনস', যাতে সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে চলার উপর গুরুত্ব দেবার কথা ছিল। সভ্যতার সংকটের পরিবর্তে ভারতের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কথা আমার ভাষণে আমি ব্যক্ত করেছিলাম। আমার ভাষণে তুলে ধরেছিলাম আলোকিত নাগরিকত্বের বিবর্তনের কথা, যার মধ্যে তিনটি উপাদান ছিল : মূল্যবোধ সম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্মকে আধ্যাত্মিক অনুষঙ্গে রূপান্তর, জাতীয় উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিকিকরণ। আমি আরো বলেছিলাম ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দীপনার কথা। মাঝে মাঝে করতালি দিয়ে আমার বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন শ্রোতারা। আমার ভাষণের শেষে আমার লেখা 'মাতৃভূমির বার্তা'কবিতাটি সমস্ত সদস্যের অনুমতি নিয়ে আবৃত্তি করেছিলাম।

মাতৃভূমির বার্তা

সুন্দর পরিবেশ চালিত হয়
সুন্দর মনগুলোর দিকে ;
সুন্দর মনগুলো জন্ম দেয়
সতেজতা আর সৃজনশীলতাকে।

স্থল আর সমুদ্রের সৃজনকারী আবিষ্কারকরা
সৃজিত মনগুলো নতুনকে আবিষ্কার করে
সৃজিত মহান বৈজ্ঞানিক মনগুলো
সৃজিত হয় যে কোনো স্থানে, কেন?

জন্ম দেয় বহু আবিষ্কার
একটা মহাদেশ আর অচেনা জমিন আবিষ্কৃত হয়,
অপ্রত্যাশিত পথগুলো প্রকাশমান হয়,
সৃজিত হয় চলার নতুন পথ।

উত্তম মনগুলোতে
নিকৃষ্টতমেরও জন্ম হয়েছিল
যুদ্ধ আর ঘৃণার বীজগুলোকে ছড়াতে
শত শত বছরের যুদ্ধ আর রক্তে।

লক্ষ লক্ষ আমাদের বিস্ময়কর শিশু,
জীবন হারিয়েছিল জলে ও স্থলে;
বহু বহু দেশ অশ্রুর বন্যায় ভেসেছিল,
অনেকেই দু:খের সাগরে ডুবে গিয়েছিল।
তারপর, এক সময়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রূপকল্প এলো,
শপথ নিল,
মানবিক জ্ঞান থেকে কখনো ফিরে যাওয়া আর নয়,
আর নয় একে অপরের বা নিজেদের মধ্যে লড়াই।

তাদের চিন্তাভাবনায় একতাবদ্ধতা
কাজ আর কাজে ব্যাপৃত হওয়া।
ইউরোপকে সমৃদ্ধ আর শান্তিময় করে গড়ে তুলতে
ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের জন্য।

ওই সমস্ত আনন্দের সংবাদে মুগ্ধ
সবখানের লোকজন।
ওহ! ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, তোমাদের রূপকল্প
ছড়িয়ে দাও সর্বত্র, আমাদের বাঁচিয়ে রাখো বাতাসকে ভালোবেসে।

কবিতা আবৃত্তি শেষ হবার পর পার্লামেন্টের প্রত্যেক সদস্য স্বতস্ফূর্তভাবে আমাকে অভিনন্দিত করায় আমার হৃদয় আপ্লুত হলো। তাদের প্রশংসা আমি আমার জনগণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম। তাদের অভিনন্দনের জবাবে আমি ভারতের কোটি কোটি জনগণের শুভেচ্ছা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোর নাগরিকদের উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন করলাম। আমার ভাষণের পর প্রেসিডেন্ট পোট্টারিং যা বললেন তা এখানে উদ্ধৃত করছি।'মি.কালাম প্রেসিডেন্ট আব্দুল কালাম, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপনাময় ভাষণ দেবার জন্য। আমরা একজন রাষ্ট্রপ্রধান, বিজ্ঞানী আর একজন কবির কাছ থেকে এই অসাধারণ বক্তৃতা শুনতে পেলাম, যা চমৎকার। মহান দেশ ভারতকে শুভেচ্ছা। আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা মহান দেশ ভারত আর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে সহযোগিতাকে। সর্বান্তকরণ থেকে মি. প্রেসিডেন্টকে শুভকামনা রইলো।'

আমার ভাষণের পরে অনেক সদস্য আমার ভাষণে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আমার সাথে আলাপ করতে চাইলেন। তাদের একটা সাধারণ ধারণা জন্মালো যে ভারত একটা মহান দেশ। মানবিক মূল্যবোধে দেশটি ঋদ্ধ।

সারা পৃথিবীর মানুষের মনে ঐক্যের বাণী পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে আমার বিবেচনায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পার্লামেন্টে আমার ভাষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অনেক দেশে আমার ভাষণ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ইউটিউব সহ অসংখ্য ওয়েবসাইটস এর মাধ্যমে গ্লোবাল দর্শকদের কাছে আমার ভাষণ পৌঁছে যায়।

ভারতে ফিরে আসার পর আমি পার্লামেন্টে ভাষণ দিয়ে আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক মিশনে যেমন এনার্জি ইনডিপেনডেন্স ও বিল্ডিং নলেজের উপর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাজ করার ইচ্ছার কথা জানালাম, যাতে ভারত এই সমস্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

≈

আমি গ্রিসে গিয়ে সক্রেটিস কেভ এ বিশেষ সফরে যেতে মনস্থ করলাম। লোকজন খুব কমই এই কেভ দেখতে যায় কারণ এটা একটা পার্বত্য এলাকার দুর্গম স্থানে অবস্থিত। আমার অনুরোধে, আমার সফরের আয়োজন করা হলো। আমি ওখানে গিয়ে ম্লান আলোতে গুহাটা দেখলাম। মাত্র কয়েক মিনিট ওখানে ছিলাম। আমার মনের মধ্যে এক ধরনের ধ্যানগম্ভীর ভাব বিরাজ করছিল। আমি ভেবে বিস্মিত হলাম বিশ্বের মহানতম চিন্তানায়কদের মধ্যে অন্যতম হয়েও কেন তাকে বিষ খায়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল। আমার স্মরণ হলো তার জীবনের চেয়েও তার বাণী ছিল গুরুত্বপূর্ণ। হঠাৎ করে গুহাটাতে অন্ধকার নেমে এলেও যে কেউ তার রেখে যাওয়া আলো দেখতে পাবে যুগ যুগ ধরে।

≈

২০০৫ সালে আমি সুইজারল্যান্ড সফর করি। বিমানবন্দরে নামার পর একটা বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। বিমান বন্দরে ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন যে আমার সফর উপলক্ষে ২৬ মে ২০০৫ তারিখকে সায়েন্স ডে উদযাপন করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা সুইস সরকারের অপ্রত্যাশিত একটা সিদ্ধান্ত। আমি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করে এজন্য ধন্যবাদ জানালাম। তিনি আমাকে জানালেন যে আমার *'ইগনাইটেড মাইন্ডস'* এবং ইন্ডিয়া ২০২০ এই দু'খানা বই পড়েছেন। তিনি তার ক্যাবিনেটকে স্পেস ও ডিফেন্স সায়েন্সে আমার অবদানের কথা জানালেন। সায়েন্স ডে ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আমার সফরসূচি দীর্ঘতর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। আমি সেখানকার সায়েন্টিফিক ল্যাবরেটরিগুলো পরিদর্শন করার এবং রিচার্স স্টুডেন্ট ও শিক্ষাবিদদের সাথে মিলিত হবার সুযোগ পেলাম। আমি

জুরিখের সুইস ফেডারেল ইন্‌স্টিটিউট অব টেকনোলজিতেও গেলাম, জার্মানি থেকে এসে ওখানেই আইনস্টাইন প্রথম পড়াশুনো করেন। আমি সেখানকার বোস আইনস্টাইন ল্যাবরেটরি দেখতে যাই। ওখানে ছয়জন ছাত্র বোস আইনস্টাইন থিওরির উপর কাজ করছিলেন। সেখানকার ফ্যাকাল্টি ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভাষণ দেবার সুযোগ পেলাম। আমি সেখানে 'টেকনোলজি এন্ড ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট' এই টপিক এর উপর আমার বক্তব্য পেশ করলাম। আমি স্যার সি.ভি রামন-এর এক্সহোরটেশন টু স্টুডেন্টস-এর উপর বক্তব্য দিয়ে আমার কথা শেষ করি। 'আমাদের প্রয়োজন বিজয় অর্জনের জন্য উদ্দীপনা। উদ্দীপনাই আমাদেরকে সঠিক স্থানে পৌছে দেবে। আমাদের সঠিক গন্তব্যে পৌছানোর জন্য উদ্দীপনার প্রয়োজন।'

≈

আমি নেলসন ম্যান্ডেলার কথা বলা থেকে বিরত থাকলে ঠিক হবে না। ২০০৪ এ আমি নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে দেখা করি। তার মতো ব্যক্তিত্বের কাছে আমি দুটো বড় ধরনের শিক্ষা লাভ করি। অদম্য উদ্দীপনার ও ক্ষমা করার গুণ।

কেপ টাউন তার টেবল পর্বতের জন্য বিখ্যাত। তিনটা চূড়ার নাম টেবল পিক, ডেভিল পিক ও ফেক পিক। দিনের বেলা চূড়াগুলোর অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। পাহাড় চূড়ায় ছেড়াছেড়া মেঘের আনাগোনা, মাঝে মাঝে কালো, মাঝে মধ্যে সাদা সাদা মেঘ। আমরা কেপ টাউন থেকে হেলিকপ্টারে চড়ে রোবেন দ্বীপ দেখতে গেলাম। দ্বীপটিতে পৌছিলে ড. ম্যান্ডেলার সাথের সহবন্দি সাউথ আফ্রিকার আহমেদ কাথার আমাকে স্বাগত জানালেন। আমি ছোট্ট রুমটি দেখে বিস্মিত হলাম। ড. ম্যান্ডেলার মতো ছয় ফুট লম্বা মানুষটি ছয় বছর ওই রুমটাতে কারাবন্দি থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যান। তার জীবনের দীর্ঘ সময় ওই দ্বীপে কাটে। বস্তুতপক্ষে, তিনি বন্দিশালায় বসে তার বিখ্যাত বই লং ওয়াক টু ফ্রিডম বইটি রচনা করেন।

তার সাথে দেখা করা আমার জন্য একটা বড় ঘটনা ছিল। তার সাথে করমর্দন করে আমি যেন একটা মহান আত্মার স্পর্শ অনুভব করলাম। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তার হাতের ছড়িটা ছেড়ে দিলেন। আমি তাকে হাত দিয়ে ধরলাম। আমি তার থেকে দুটো শিক্ষা অর্জন করলাম।

≈

আমার ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ে। ট্রেনের সাথে আমার সম্পৃক্ততা ছোটবেলা থেকেই। আমি ছোটবেলা ট্রেন থেকে সংবাদপত্র সংগ্রহ করে রামেশ্বরম শহরে বিলি করার ব্যবস্থা করতাম। দেশগ্রাম দেখা আর তার ঘ্রাণ নেবার জন্য ট্রেন ভ্রমণ অতি উত্তম। কুয়াশায় চারদিক ঢেকে থাকলে মাঠের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও গ্রামগুলো যেন ট্রেনের কাছে চলে আসতো। আমার কাছে ট্রেন ভ্রমণ ছিল অতি প্রিয়। আমি প্রেসিডেন্টাল ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

দুটো কোচের একজোড়া মিলিয়ে প্রেসিডেন্টাল সেলুন, যা রাষ্ট্রের প্রধানের জন্য সংরক্ষিত। কোচে একটা ডাইনিংরুম, একটা ভিজিটিংরুম, একটা লাউন্স রুম, একটা কনফারেন্সরুম আর প্রেসিডেন্টর জন্য একটা বেডরুম। সেখানে আরো ছিল একটা কিচেন আর প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারি ও স্টাফদের জন্য চেম্বার। রেলওয়ে স্টাফদেরও থাকার ব্যবস্থা ছিল। কোচগুলো দামী আসবাবপত্র আর সিল্কের কুশন দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছিল।

কোচগুলো ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ এর প্রথম পর্যন্ত চলতে দেখা গিয়েছিল। সে সময় একটা রীতি চালু হয়ে গিয়েছিল প্রেসিডেন্ট তার মেয়াদ শেষ করার পর দিল্লি থেকে যাত্রা করে তার ইচ্ছে মত যে কোন স্থানে যাত্রা করতেন। ১৯৭৭ এ নীলম সঞ্জীব রেড্ডি এভাবে শেষ ট্রেন যাত্রা করেন। তারপর থেকে নিরাপত্তাজনিত কারণে কোচগুলোকে ব্যবহার করা না হলেও ট্রেনগুলোকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজ চলে আসছিল। আমি ছাব্বিশ বছর পর ২০০৩ এর ৩০ মে তে হরনাথ থেকে পাটনা পর্যন্ত ৬০ কিলোমিটার ট্রেন ভ্রমণ করি। কোচগুলোকে আধুনিক সরঞ্জামে সাজানো হয়। স্যাটেলাইট ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও কোচগুলোতে সংযোজিত হয়।

আমি আরো দুটো ট্রেন ভ্রমণ করেছিলাম। একটা ছিল ২০০৪ এ চন্ডিগড় থেকে দিল্লি পর্যন্ত। তৃতীয় ট্রেন ভ্রমণ যাত্রা ছিল ২০০৬ এ দিল্লি থেকে দেরাদুন পর্যন্ত। হরনাথ থেকে পাটনা পর্যন্ত ট্রেন যাত্রার বহুমুখী উদ্দেশ্য ছিল। আমি হরনাথে রেলের একটা ওয়ার্কসপের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। রেলওয়ে মিনিস্টার নিতিশ কুমার এতে খুবই খুশি হন। তার নিজের রাজ্যে রেলের অনেকগুলো কমপ্লেক্স স্থাপন করতে দেখে সকলেই হেসেছিল।

আমি আমার ভাষণে হরনাথের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম যে আমি একটা প্রাচীন ঐতিহাসিক সাইট নালন্দা থেকে অনেক কিছু জানতে এসেছি। আমি আশা করেছিলাম বিহারের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুনভাবে পুনোরুদ্ধার করা হবে, সেখান থেকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবে শান্তির বাণী।

ওই ট্রেন জার্নিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিহারের পনেরোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের আমি ট্রেন ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলাম। তাদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যাদি নিয়ে এক ঘন্টা আলোচনা করেছিলাম। আমি তাদের কাছে জোর দিয়ে বলেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এমন কোর্স চালু করতে হবে যাতে রাজ্যগুলোর উন্নয়ন ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যা দূর করার জন্য বিহারের গভর্নর বিশেষ আগ্রহ দেখান। দু'বছর পরে আমি দেখতে পাই বিহারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্যালেন্ডার ভিত্তিক পরীক্ষা চালু হয়েছে।

ট্রেন ভ্রমণের একটা আনন্দদায়ক পাদটিকা। পাটনা রেলওয়ে স্টেশনে আমি রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা লালুপ্রসাদ যাদব এবং জনতাদল (ইউনাইটেড) এর নেতা নিতিশ কুমার কে দেখতে পেলাম, তারা আমাকে স্বাগত জানাতে এসেছেন। তারা উভয়ে আলাদা আলাদা পথের মানুষ। আমি ট্রেন থেকে নামামাত্র দুই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে একসাথে দেখলাম। তাদেরকে পরস্পরের সাথে করমর্দন করতেও দেখলাম। স্টেশনে উৎফুল্ল জনতার জমায়েত চোখে পড়লো।

২০০৪ এর ৫ জানুয়ারি চিলড্রেন'স সায়েন্স কংগ্রেস উদ্বোধন করতে আমি চন্ডিগড় যাই। আমি ওখানকার সায়েন্টিফিক কমুনিটিতেও ভাষণ দেই। গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকায় ৬ জানুয়ারি আমি দিল্লিতে ফিরে আসি। অতি প্রত্যুষে কুয়াশার আশংকা থাকায় সঠিক সময়ে দিল্লিতে ফিরবার জন্য আমাকে ট্রেনে আসতে হয়। সায়েন্স কংগ্রেসের উদ্বোধন করায় আমি বিশেষভাবে আনন্দিত হই। দেশের সারা অংশ থেকে প্রায় এক হাজার ছাত্রছাত্রী তাদের প্রজেক্ট নিয়ে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিল।

২০০৬ এ আমি তৃতীয়বার ট্রেনে ইন্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমীর প্যারেড অনুষ্ঠানে সালাম গ্রহণ করার জন্য দেরাদুন যাই। সময়টা শীতকাল হওয়ায় সকালে কুয়াশা হলে সঠিক সময়ে পৌঁছানো অনিশ্চিত হতে পারে ভেবে বিমানে না গিয়ে ট্রেনে যেতে হয়। রাতেও বেশ কুয়াশা ছিল। ট্রেন সফদার জং স্টেশন

থেকে কোথাও না থেমে দেরাদুন পৌছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা বিধানের জন্য বেশ কয়েকটা চেকপোস্ট তৈরি করে।

উৎফুল্ল স্নাতক উপাধিধারী অফিসারদের সাথে মিলিত হতে পেরে আমি আনন্দিত হলাম। অনেক স্নাতক অফিসার আমাকে প্রশ্ন করলেন প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত কি ধরনের অগ্রগতি করতে যাচ্ছে। সীমান্ত সংলগ্ন কয়েকটা নর্থদার্ন ইউনিটস এ একটা সফরের সময় এক দল অফিসারদের সাথে আমি মিলিত হয়েছিলাম। সীমান্তের ওপারের পাকিস্তানী আর্মি পারসোনেল আমার এই সফরের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। আমি সেখানে বিভিন্ন ইউনিটের দু'শত তরুণ অফিসারদের সামনে বক্তব্য রেখেছিলাম। আমার বক্তব্য দেবার পর বাদা খান্না এর উদ্দেশ্যে রওনা হবার আগে আমি তরুণ অফিসারদের কাছে একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম। আমি বললাম, 'প্রিয় তরুণ অফিসারবৃন্দ, তোমাদের সামনে সেনা বাহিনীর সার্ভিসের তিরিশ বছরের চেয়েও বেশি সময় পড়ে আছে, তোমরা কি আমাকে বলতে পার, তোমরা একজন অফিসার হিসাবে কোন অনুপম মিশন সম্পাদন করতে পছন্দ করো।' সিনিয়র অফিসাররা নীরব ছিল কিন্তু তরুণ অফিসাররা হাত তুললো। আমি একজন অফিসারকে জবাব দেবার জন্য বেছে নিলাম। আমাকে সালাম জানিয়ে অফিসারটি বললো, 'স্যার, আমার একটা স্বপ্ন আছে। সেই স্বপ্নটা হলো আমার জাতির যে সমস্ত জমিন অন্যেরা দখল করে রেখেছে সেইগুলো ফিরে পাওয়া।' সবার মধ্যে যেন বিদ্যুত প্রবাহিত হয়ে গেল। প্রত্যেকেই তরুণ অফিসারটিকে অভিনন্দন জানালো। আমি স্নাতক উপাধি প্রাপ্ত তরুণ অফিসারদের কাছে সেই তরুণ অফিসারের দেওয়া উত্তরটার কথা জানালে সেখান থেকেও একই জবাব এলো। 'আমরাও অবশ্যই ওইটাই করবো, স্যার।' এইসব কারণে ট্রেন জার্নিটা আমার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে।

আমি সুদানে সবচেয়ে সুন্দরতম একটা দৃশ্য দেখেছিলাম, যেখানে ব্লু নাইল আর হোয়াইট নাইল এক জায়গায় মিলিত হয়ে সঙ্গমস্থলে আলাদা একটা রঙে পৃথক নদীতে রূপান্তরিত হয়েছে। একই রকম থাকলেও লোকজনদের সাথে মিলিত হয়ে আমরাও পরিশুদ্ধ হই।

১১

পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত ভারতের হৃদয়

গ্রামগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যেই গ্রাম আন্দোলনের যাত্রা। তারা সেবার উদ্দীপনায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে নিজেদেরকে সুসংহত করে নিজেদেরই মুখায়ব দেখতে পাবে গ্রামবাসীদেরকে সেবাদান করে...

– মহাত্মা গান্ধী

গ্রামগুলো নিয়েই ভারত। গ্রাম থেকেই কৃষ্টি, সভ্যতা, রীতিনীতি আর জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে। আমি জন্মেছিলাম একটা গ্রামে বড়ও হয়েছি একটা গ্রামেই। আমি গ্রাম্যজীবনের ছন্দ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্রামগুলো থেকে মানুষের শহরে পাড়ি জমানোর হার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাম থেকে শহরে প্রস্থান করা মানুষগুলোর জীবন চরম দুর্দশার মধ্যে বস্তিতে কাটাচ্ছে। তাদের খিদে মেটাতে তারা আয় উপার্জন করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের জীবন থেকে ভালোবাসা আর বেঁচে থাকার আশা হারিয়ে গেছে। গ্রামগুলোকে উন্নয়ন করার মাধ্যমেই শুধুমাত্র ভারতের গ্রামগুলোর মানুষের আয় বাড়ানো, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন আর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব, আমি বিশ্বাস করি গ্রামের মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিমূল করার মাধ্যমেই গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা মানুষের স্রোতবন্ধ করা সম্ভব। এই চিন্তাভাবনার আলোকেই **পিইউআরএ** (প্রোভাইডিং আরবান এমেনিটিস টু রুরাল এরিয়া) এর আইডিয়া গ্রহণ করা হয়েছিল।

কোন রাজ্যের উন্নয়নের জন্য অবশ্যই সেই রাজ্যের গ্রামগুলোর উন্নয়ন করতে হবে। এই জ্ঞান থেকেই গ্রামগুলো পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করেছিলাম। ২০০২ এ আমি প্রথম ভোপাল সফরে গিয়ে আমি টোর্নি গ্রামে গিয়েছিলাম। সেই গ্রামে না ছিল ভালো রাস্তা, না ছিল বিদ্যুত। ওই গ্রামে যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করা মাত্র রাজ্যসরকার অনেকগুলো কাজ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

প্রথমে সব মৌসুমে চলার উপযোগী কয়েক মিটার লম্বা রাস্তা তৈরি করা হয়। তড়িত গতিতে গ্রামটিতে বিদ্যুত পৌঁছে দেওয়াও হয়।

টৌর্নি গ্রাম পরিদর্শনকালে গ্রামবাসীরা ছিল খুবই খুশি। তাদের তৈরি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আর জৈবিক কীটনাশক ব্যবহার পদ্ধতি আমাকে প্রদর্শন করে। আমি জেলা কতৃপক্ষকে বললাম টৌর্নি গ্রামের মতো এলাকার অন্যান্য গ্রামগুলোকেও উন্নয়ন করতে হবে। অন্যান্য গ্রামগুলোর মানুষেরাও টৌর্নি গ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের গ্রামগুলোকেও উন্নত করতে সক্ষম হবে। আমি রাজ্য সরকারকেও পরামর্শ দিলাম যে গ্রামগুলোকে ক্লাস্টার ভিত্তিক দলে বিভক্ত করে পারস্পরিক যোগাযোগের সুব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এতে শুধুমাত্র বাহ্যিক যোগাযোগই স্থাপিত হবে না রাস্তাঘাট, পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নয়ন ঘটবে। ভিলেজ ক্লাস্টারে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ফলমূল শাকসব্জী ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সহ অন্যান্য শিল্পও গড়ে উঠবে। আমি চিফ মিনিস্টার ও জেলা কর্তৃপক্ষকেও পরামর্শ দিলাম, স্যাটেলাইট পিকচারের সাহায্য নিয়ে মধ্যপ্রদেশের গ্রামগুলোর পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উপর জরিপ চালিয়ে গ্রামগুলোতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে। টৌর্নি এলাকার যুবকরা তাদের মিডিল স্কুলকে আপগ্রেডিং করে সেকেন্ডারি স্কুলে রূপান্তর করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানালেন। রাজ্য সরকার তা করতে সম্মত হলো।

টৌর্নি গ্রাম সফর করে আমি উন্নয়নের নানা দিকদর্শন খুঁজে পেলাম। আমি উপলব্ধি করলাম গ্রামগুলোর সাথে শহরের সেতুবন্ধন রচনা করা একান্তই প্রয়োজন।

≈

আমি রামেশ্বরম গ্রামে জন্মে ছিলাম, বড়ও হয়েছিলাম ওই গ্রামেই। ওখানকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমার মনে প্রায় প্রায়ই ভেসে উঠতো কিভাবে গ্রামের লোকদের আয় উপার্জন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে। আমার পেশাগত কাজ বৃহত্তর নগরীতে হলেও দূরদূরান্তের এলাকাতে যাবার বেশ কয়েকটা সুযোগ ঘটেছিল আমার। ভারতের ৬০০,০০০ গ্রামের উন্নয়ন করার মধ্যেই ইন্ডিয়া ২০২০ প্রোগ্রামের উন্নয়নধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিহিত ছিল। আমার বন্ধু প্রফেসর পি.ভি.ইন্দিরেসান আমার কাছে **পিইউআরএ**

এর আইডিয়াটা আমাকে জানাতে এলে আমি তার সাথে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করলাম। একই বিষয়ে আগ্রহী বিশেষজ্ঞদের সাথেও আমার আলোচনা হলো। পিইউআরএ এর মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হলো। তাদের কাছ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রামোন্নয়নের জন্য আমি পৌর এলাকার চেয়ে গ্রামাঞ্চলে বেশি বেশি সফর করলাম। আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি পিইউআরএ এর জন্য কমপ্লেক্স স্থাপন করতে মনস্থ করলাম। আমরা নগরবাসীর সাথে আলোচনা করে জানতে পারলাম গ্রামের দিকে উন্নয়নের ছোঁয়া না লাগায় তারা গ্রামের দিকে ফিরে যেতে চায় না। অপর দিকে গ্রামের লোকজন গ্রামে ভালো সুযোগ সুবিধা না থাকায় ভালো জীবন যাপনের আশায় গ্রাম ছেড়ে শহর মুখী হয়। আমরা কি গ্রামের লোকজন বিশেষ করে যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে শহর মুখী হওয়া রুখতে পারি না?

আমাদের দেশের সরকার, প্রাইভেট, আর পাবলিক সেক্টরগুলো গ্রামের উন্নয়নের জন্য অংশ গ্রহণ করে আসছে। উদাহরণ হিসাবে, একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, রাস্তাঘাট তৈরির মতো কাজ তারা করে থাকে। গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছিলাম এই সমস্ত উদ্যোগ ভালোভাবেই করা হচ্ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পানি সম্পদের বিপর্যয় দেখা দেবার কারণে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন ব্যহত হয়েছে। আমরা চিন্তাভাবনা করে দেখলাম শুধুমাত্র টেকসই পরিকল্পনার মাধ্যমেই যথাযথভাবে গ্রামোন্নয়ন করা সম্ভব।

≈

আমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারি যে গ্রামোন্নয়ন করা ভারতের উন্নয়নের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গ্রামগুলোর উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? যা বোঝায় সেগুলো হচ্ছে :

১. গ্রামগুলোকে অবশ্যই পাকারাস্তা আর যেখানে প্রয়োজন সেখানে রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত করতে হবে। সেগুলোতে অন্যান্য অবকাঠামো যেমন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এবং অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গড়ে তোলা দরকার। স্থানীয়

বাসিন্দাদের সাথে বাইরের পরিদর্শকদেরকেও সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। বাইরের পরিদর্শকদের অবশ্যই গ্রামে স্বশরীরে উপস্থিত হতে হবে।

২. বিকাশমান জ্ঞানভিত্তিক যুগেও দেশীয় জ্ঞানের পাশাপাশি সর্বশেষ টেকনোলজির সরঞ্জামাদি সরবরাহ, প্রশিক্ষণ আর গবেষণারও ব্যবস্থা রাখতে হবে। গ্রামে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ভালো শিক্ষকদেরকে গ্রামে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের অবশ্যই উত্তম চিকিৎসা সেবাদান করতে হবে। কৃষি, ফিসারী, হর্টিকালচার এবং খাদ্যপ্রক্রিয়া জাতকরণ এর ব্যবস্থাও রাখতে হবে। এসব করতে গেলে অবশ্যই ইলেক্ট্রোনিক ব্যবস্থাকে গ্রামে আনতে হবে।

৩. একবার গ্রামে সড়ক আর ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলেই জ্ঞানভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। ফলে গ্রামগুলোতে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদিত জিনিসের বাজারও খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। উৎপাদিত জিনিসের গুণগতমান সম্বন্ধে সচেতনা বৃদ্ধি, ওয়ার্ক পার্টনারদের সাথে মতবিনিময় সহ বিভিন্ন কাজের দ্বারা জ্ঞানভিত্তিক সম্পৃক্ততা ঘটবে।

৪. এইগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করতে পারলে গ্রামবাসীর আয় উপার্জন অর্জন করতে সক্ষম হবে। **পিইউআরএ** এর মিশন গ্রহণ করার দ্বারা আমরা গ্রামগুলোর উন্নয়ন ঘটিয়ে সমৃদ্ধশালী জ্ঞানভিত্তিক কেন্দ্র গ্রামে গড়ে তুলতে পারবো। তার ফলে গ্রামবাসীরা উন্নয়নমুখী উদ্যোগী হবার সুযোগ পাবে।

পেরিয়ার **পিইউআরএ** কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত ছিল পেরিয়ার মণিআম্মান কলেজ অব টেকনোলজি ফর উইমেন,বাল্লাম। আমি এই কমপ্লেক্সটি ২০০৩ এর ২০ ডিসেম্বর উদ্বোধন করি। ২০০৬-এর ২৪ সেপ্টেম্বর আমি আবার ওই কমপ্লেক্সটি পরিদর্শন করতে যাই। ২০০৩ এ পঁয়ষট্টিটি গ্রামের ১০০,০০০ জন লোক নিয়ে **পিইউআরএ** গঠিত হয়। আমি দ্বিতীয়বারের পরিদর্শন কালে গ্রামগুলোর চেহারা দেখে বিস্মিত হই। আমি দেখতে পাই গ্রামের যুবক-যুবতী উন্নয়নমূলক কাজে লিপ্ত হবার ফলে

তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। বিপুল সংখ্যক লোকের কর্ম সংস্থান হয়েছে, উদ্যোক্তাদের দলও গঠিত হয়েছে। ১,৮০০ টি সেল্পহেল্প গ্রুপকে উন্নয়নমূলক কাজ করতে দেখা যায়। পেরিয়ার মণিআম্মান কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। কৃষি, শিক্ষা, চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গড়ে উঠায় পঁয়ষট্টিটি গ্রামের মানুষের জীবনযাপনের স্টাইল উন্নত হয়েছে। আমি তাদের উন্নতি দেখে খুশি হলাম।

নানাজী দেশমুখ তার দলের সদস্যদের নিয়ে মধ্যপ্রদেশের চিত্রকুট পিইউআরএ তে দীনদয়াল রিচার্স ইনস্টিটিউট (ডিআরআই) গঠন করেন। ডিআরআই এমন একটা প্রতিষ্ঠান যা ভারতের গ্রামোন্নয়নের মডেল হিসাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। প্রতিষ্ঠানটি জনগণের ক্ষমতাকে রাজনৈতিক ক্ষমতার চেয়েও বেশি গুণ স্থিতিশীল করে। ডিআরআই গ্রামগুলোকে একশটা ক্লাস্টারে বিভক্ত করে। চিত্রকূট এর পাশে প্রায় পাঁচটা গ্রামেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে। ১৬ টি ক্লাস্টারের ৫০,০০০ লোক এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয়। দেশীয় ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাতনি নামের একটা গ্রামে ডিআরআই টেকসই উন্নয়ন সাধন করে। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামগুলোতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি, আর চাকরির ব্যবস্থা সুসংহত হয়। শিক্ষার হার ১০০ পার্সেন্টে উন্নিত করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। নানাজী দেশমুখ তার প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। গ্রামবাসীরা মামলা মোকদ্দমা কোর্টে না পাঠিয়ে নিজেদের উদ্যোগে মিটিয়ে ফেলতে স্বচেষ্ট হয়। চিত্রকূটের পাশের গ্রামগুলোও এই সুবিধা লাভ করে।

আমি দেখতে পাই চিত্রকূট প্রকল্প গ্রামীণ ভারতে উন্নয়নের বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন অটুট হয়। নারী সমাজ এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত গ্রামগুলোতে সবার জন্য শিক্ষা আর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। অর্থনেতিক উন্নয়নের ফলে মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে শিল্প, সাহিত্য, মানবিকতা, মহানুভবতা আর চিন্তাচেতনায়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামগুলোতে ভারতের পাঁচ হাজার বছরের অতীত ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটে। পিইউআরএ এর অভিনন্দিত

আন্দোলনের মাধ্যমেই বিভিন্ন এলাকায় পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারসিপ সংস্থা গড়ে উঠে। আমি নিশ্চিত হই এটা ভেবে যে ভারত অদূরভবিষ্যতে সারা ভারতের গ্রামগুলোতে ৭,০০০ পিইউআরএ কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

গান্ধিজী বলেছিলেন, প্রকৃত ভারত তার গ্রামগুলোর মাঝেই স্থান লাভ করে আছে। এদের বিপুল সংখ্যক জনগণের মানবিকতাই ভারতকে সাহায্য করতে পারে পৃথিবীতে পূর্ণমাত্রায় অবদান রাখতে।

১২

উদ্যানে

আমি আনন্দ-বেদনাকে বন্দি করতে কোন দেওয়াল তুলি না
উৎসর্গ কিংবা অর্জন,লাভ কিংবা ক্ষতি,
আমি সব খোলা জায়গায় ফুল জন্মাই,
পুকুর আর নদীতে লিলি ফুলগুলো ভাসতে থাকে।

আমাকে ১৯৯৭ এ ভারতরত্ন পুরস্কার দেবার সময় চিত্রা নারায়ণন (রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণনের মেয়ে) আমাকে, আমার ভাই আর তার নাতিকে মোঘল গার্ডেনের চারদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানোর জন্য নিয়ে যান। সেটা ছিল উৎফুল্ল হবার মতো একটা অভিজ্ঞতা। আমি তার কাছে পূর্ণিমার একটা রাতে মনোমুগ্ধকর উদ্যানটি দেখবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম। রাষ্ট্রপতি আর তার স্ত্রী মিসেস ঊষা নারায়ণন আমার ইচ্ছের কথা জানতে পারেন। তারপর যখনই অফিসিয়াল ভোজসভায় যোগদান করেছি তখনই রাষ্ট্রপতি এবং ফার্স্ট লেডি আমাকে রাষ্ট্রপতিভবনে অবস্থান করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি তখন উপলব্ধি করতে পারি নি ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতিভবনে ষাটটি পূর্ণিমার রাত আমি কাটাতে পারবো।

এক সময় আমি রাষ্ট্রপতিভবনে এলাম। মোঘল গার্ডেন আমার কাছে প্রয়োগিক অর্থে একটা প্লাটফরম হয়ে উঠলো। এই উদ্যানটি আমার সাথে প্রকৃতি আর দেশের নাগরিকদের যোগাযোগের একটা ক্ষেত্র হয়ে উঠলো। ওখানেই আমি দেশের সর্বস্তরের মানুষের সাথে মিলিত হই। যাদের সাথে আমি মিলিত হই তাদের মধ্যে ভেষজ উদ্ভিদের বিশেষজ্ঞরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পশু-পাখিরা আনাগোনা করে অবিরতভাবে। তারা আমার সার্বক্ষণিকের সাথী ছিল। উদ্যানের শান্তসমাহিত পরিবেশে বেড়ে উঠা গাছগুলোর মধ্যে আমি শান্তির আবেশ অনুভব করলাম।

বেশ কয়েকটা অনুষ্ঠানে আমি সফররত রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানদের সাথে এই উদ্যানে হেঁটেছিলাম। ২০০৭ এর সার্ক দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে এই উদ্যানে বেড়ানোর কথা স্মৃতিতে বিশেষভাবে ভাস্বর হয়ে আছে। আমার মনে পড়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শওকত আজিজের মন্তব্য, যদি আমরা মোঘল গার্ডেনে বসে দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারতাম তবে আমাদের দু'দেশের মানুষের মনের জমানো বরফ গলতে শুরু করতো। শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীকে এক ঘন্টার জন্য এই উদ্যানে চা পানে আপ্যায়ন করেছিলাম। আমি এখানকার সুন্দর লনে আমাদের রিজিয়নের উন্নয়নের জন্য আলাপ আলোচনার আয়োজনও করেছিলাম। আমি উদ্যানে দুটো কুটির তৈরি করিয়েছিলাম, দুটোর ডিজাইনই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাকৃতিক উপকরণ দ্বারা তৈরি করানো হয়। একটা তৈরি করেছিলেন ত্রিপুরার কারিগররা। ওটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'থিংকিং হাট' আমি আমার বহু ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে এই কুটিরে উইকএন্ড এ আলাপ আলোচনা করতাম। এই কুটিরে বসে আমি আমার ***ইনডোমিটেবল স্পিরিট*** বইখানার অধিকাংশটাই লিখেছিলাম। দ্বিতীয় কুটিরটির নাম দিয়েছিলাম। এই কুটিরটি ষোলটি গাছ, চৌত্রিশ প্রকারের ভেষজ গাছের বাগান, একটি মিউজিকাল চত্বর এবং একটা বায়োডাইভারসিটি পার্ক দ্বারা বেষ্টিত ছিল। 'ইমমোর্ট্রাল হাট' এ বসে আমার বন্ধু প্রফেসর অরুণ তেওয়ারির সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে **গাইডিং সোল** নামের আমার লেখা বইখানিতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশ করি। কঠিন জাতীয় ইস্যু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার প্রশ্ন দেখা দিলেই আমি এই দুটো কুটিরে বসে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই কুটিরে বসে আমি আমার কবিতা লেখার অনুপ্রেরণাও পেয়েছি।

≈

রাষ্ট্রপতিভবনের জমির পরিমাণ ৩৪০ একরেরও বেশি। অন্যদিকে, মোঘল গার্ডেন পনেরো একর আয়তনের। উদ্যানটিতে তিনটি বড় বড় চত্বর রয়েছে। চত্বরগুলো আয়তকার। আয়তকার চত্বর এবং মূল মোঘল গার্ডেনে সুন্দর সুন্দর জিনিসে ভরপুর। চারটি খাল, ছয়টা ঝর্ণা, ৭০ বর্গ মিটারের কেন্দ্রীয় লন (এই লনে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক জাতীয়সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রজাতন্ত্র দিবস এবং

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানও এখানেই অনুষ্ঠিত হয়।) পত্রপল্লবে সুসজ্জিত বৃক্ষরাজি, সুন্দর সুন্দর গোলাপের বাগান, বিভিন্ন আকারের আরো কয়েকটি লন। উদ্যানটি বড় একটা লম্বা লনের সাথে যুক্ত, যেখান থেকে দ্বিতীয় চত্বরটা আরম্ভ হয়েছে। লম্বা লনটাতে ৫০ মিটার লম্বা মূল পথ। মাঝখানটা লতানো ফুলের গাছের সমারোহ। পথের উভয় পাশে গোলাপের বেড আর চাইনিজ অরেঞ্জের সারি। লম্বা উদ্যানটা পশ্চিম দিকের তৃতীয় অংশের সাথে যুক্ত। গোলাকার চত্বরটাকে গোলাকার উদ্যান বলা হয়। সব ফুল ফুটলে এটাকে মনোমুগ্ধকর মনে হয়। বিখ্যাত লনটাতে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবলু.বুশ, তার পত্নী এবং তার সাথে আসা অতিথিদেরকে ভোজে আপ্যায়ন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতিভবনের এই ভোজসভায় বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদেরকেও আপ্যায়ন করা হয়েছিল। ভোজসভায় উপস্থিত হয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট দম্পতি গভীরভাবে আপ্লুত হয়েছিলেন।

মোঘল গার্ডেনের ওই তিনটা চত্বরের অন্যান্য উদ্যানগুলো ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে মার্চের মাঝামাঝির মধ্যে সুন্দরভাবে সেজে উঠে। শীতকালীন ফুলগুলো সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় আর অন্যদিকে গোলাপ, লতানো ফুলের গাছ আর ঝোপঝাড় ফুলে ফুলে ভরে যায়।

ড. ব্রহ্মা সিং অফিসার অন স্পেশিয়াল ডিউটি মোঘল গার্ডেনের ফুলের বাগানগুলোকে নানা ফুলের সমারোহে সুজ্জিত করার জন্য তালিকা তৈরি করতে লেগে পড়েন। অ্যাক্রোস্তিনিয়াম, অ্যানটিরহিনাম, ব্রাসিকম, বেগোনিয়া, ক্যালেন্ডুলা, ক্যাম্পানুলা, ক্যন্ডিটাফটন্ডিটা, করোনেশন, ক্রিসানথেমাম, সেলোসিয়া, চায়না, অস্টার, সিনেরারিয়া, ক্যালিওপসিস, কসমস, ক্লার্কিয়া, কর্ণফ্লাওয়ার, ডেইজি, ডেলফিনিয়াম, ডায়ানথাস, ডালিয়া এবং আরো অনেক নামের ফুলে ফুলে ভরে উঠে ফুল বাগানগুলো।

হাজার হাজার মানুষ এই উদ্যানের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। কোন প্রকার প্রবেশমূল্য ছাড়াই উদ্যানটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এখানে বিশেষ বিশেষ অতিথিদের জন্য জাতীয় দিবসগুলোতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এইসব অতিথিদের মধ্যে থাকেন কৃষক, প্রতিরক্ষাবাহিনীর লোকজন, সিনিয়র সিটিজেন, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধিরা সহ আরো অনেকেই। ড. ব্রহ্মা সিং রাষ্ট্রপতিভবনের বৃক্ষরাজিকে সুন্দরভাবে ইলাস্ট্রাটেড করে পুস্তক প্রকাশ করেন।

২০০২ এর দিকে আমি ভাবলাম কেমন করে রাষ্ট্রপতিভবনের জমিকে আরো ফলফুলে সুসজ্জিত করে তোলা যায়। কিভাবে বেশি আরো জায়গাকে সবুজ অরণ্যে পরিণত করা যায়। পাহাড়ের উচ্চতায় পাহাড়ি মাটিতে শাকসব্জি আর ফুল বাগান করা আমার কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি রাষ্ট্রপতিভবনকে বৃক্ষলতা আর ফলফুলে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নিলাম। ডিআরডিও-এর কৃষি বিজ্ঞানী ও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড এগ্রিকালচারাল রিচার্স এবং কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাসট্রিয়াল রিচার্স (সিএসআইআর) সাথে পরামর্শ করলাম। ড. ব্রহ্মা সিং এর সহায়তায় বারটি গার্ডেন তৈরি করে খুশি হলাম।

≈

ভারত এবং বিদেশে খুব কম সংখ্যক ট্যাকটাইল গার্ডেন আছে। লাখনৌ এর সিএসআইআর এর ন্যাশনাল বোটানিক্যাল রিচার্স ইনস্টিটিউট (এনবিআরআই) এ একটি ট্যাকটাইল গার্ডেন আছে। আমি তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ২০০৪ এ রাষ্ট্রপতিভবনে ট্যাকটাইল গার্ডেন তৈরি করলাম। এটা একটা ইলিপটিক্যাল গার্ডেনও হলো। গার্ডেনটাতে একটা ঝর্ণা, একটা পাথরের পথ, আর সুগন্ধি গাছ, ভেষজ, মশলা, ফল আর অলঙ্করণযুক্ত ফুলের গাছের চৌত্রিশটি বেডের একটা হাউস তৈরি করা হলো। প্রত্যেক বেডে একটা সাইনবোর্ডও লটকানো হলো গাছের বিবরণ ব্রেইল, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় লিখে। এই গার্ডেন পরিদর্শন করে অনেকেই রোমাঞ্চিত হলো।

≈

এক রবিবারে 'ইমমোর্ট্যাল হাট' এ বসে ড. ব্রহ্ম সিং ও আমার বন্ধু ড. ওয়াই. এস. রাজনের সাথে আলোচনাকালে একটা মিউজিক্যাল গার্ডেন তৈরির আইডিয়া মাথায় এলো। আমরা অনুভব করলাম বটবৃক্ষের বন আর বায়োডাইভারসিটি

পার্কের ক্ষতির কারণে মিউজিক্যাল পার্কের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ২০০৬ এ একটা মিউজিক্যাল ফাউন্টেনের আয়োজন করা হলো। এই প্রোজেক্ট এর সাথে সম্পৃক্ততা ছিল বহুমুখী প্রযুক্তি, যেমন ডিজিটাল

ইলেক্ট্রোনিক্স, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিসম, হাইড্রোডাইনামিকস, হাইড্রোস্ট্যাটিক্স আর হিউম্যান ক্রিয়েটিভিটি। ভেতর দরজার মধ্যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করা যায়। রাষ্ট্রপতিভবনে মিউজিক্যাল গার্ডেন তৈরি করাছিল একটা গর্বের বিষয়। এক পূর্ণিমার রাতে মনমুগ্ধকর মুহূর্তে রাষ্ট্রপতিভবনের মিউজিক্যাল গার্ডেনে ৫০০ শ্রোতার সামনে পন্ডিত শিবকুমার শর্মার সানতুর বাজনা ছিল মনে রাখার মতো।

≈

কয়েক প্রকারের পশুপাখির প্রজাতি সংখ্যা বাড়ানো, একটা জলপ্রপাত, ফিস পন্ড, খরগোশ, হাঁসের ঘর, পাখিদের বাসা, অসুস্থ পশুদের আশ্রয় স্থল তৈরির মাধ্যমে কয়েক বছর ধরে বায়োডাইভারসিটি পার্কের উন্নয়নের কাজ চলছিল। পার্কটি শুধুমাত্র প্রকৃতি আর পশুপাখিদেরকে ভালোবেসেই করা হয় নি, সুখ আর শান্তির অন্বেষায় এটা তৈরি করা হয়েছিল। একদিন প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে আমি পরিত্যাক্ত একটা হরিণের বাচ্চা দেখতে পেলাম। আমার সাথী ড. সুধীর আর আমি দেখতে পেলাম তার দুটো পা তার জন্মের সময়ই দুর্বল হওয়ায় হরিণ বাচ্চাটি দাঁড়াতে পারছে না। ড. সুধীর তার পা দুটোতে হাত বুলিয়ে দেখলো। তারপর আমরা ওটাকে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমরা ব্যর্থ হলাম। আমি প্রতিদিন বোতলে দুধ ভরে খাওয়াতে থাকলাম। এক সপ্তাহের মধ্যে হরিণ শিশুটি উঠে দাঁড়ালো, আর এক সময় সে হাঁটতে শুরুও করলো। সে আমাকে দেখলেই দুধের জন্য ছুটে আসতো। কয়েক সপ্তাহ পরে হরিণ শিশুটিকে হরিণের দলের কাছে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করা হলো। হরিণের দলটি তাকে সাদরে গ্রহণ করলো। আমি স্বস্তিবোধ করলাম।

রাষ্ট্রপতিভবনের দিনগুলো আমাকে নস্টালজিক অনুষঙ্গে ধরা দেয়। মোঘল গার্ডেন আর অন্যান্য গার্ডেনের সুখানুভূতি আমাকে নাড়া দেয়। ওখানটাতে যে আনন্দ ছিল তা আমি অন্যের সাথে শেয়ার করেছিলাম- উদাহরণস্বরূপ গার্ডেনে দেশের প্রখ্যাত শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠানের কথা বলা যায়। আমাকে প্রকৃতিকে উপভোগ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি সর্বশক্তিমানের কাছে মাথা নত করি।

১৩

বিতর্কমূলক সিদ্ধান্তসমূহ

সচেতন আত্মার আলো

রাষ্ট্রপতি থাকাকালে এবং তার আগে পরে আমার চিন্তাভাবনা এবং কাজকে বিশ্লেষণ করা কষ্টকর। একজন ব্যক্তির তিনটি সময়কালের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতার ধরন একেক রকম। সংঘটিত কাজগুলো যুক্তিতর্ক আর কার্যকারণের উপর ভিত্তি করে আমার ব্যক্তিগত আবেগের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিহার অ্যাসেম্বলি ভেঙ্গে দেবার পরিপ্রেক্ষিতে আমার ব্যক্তিগত আবেগের উপর প্রথম প্রভাবটা পড়লো। আমি এই ইস্যু নিয়ে বহুবার আলোচনা করেছি। আমার আমলে আইটি সেক্টরে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। রাষ্ট্রপতিভবনের সাথে ইলেক্ট্রোনিক্যাল সংযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। যখনই প্রয়োজন তখনই আমি যেকোন স্থানের যে কোন ব্যক্তি কিংবা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে পারি। তাৎক্ষণিক যোগাযোগের জন্য ইমেলেরও সুবিধা আছে। আমি মস্কো থাকাকালে মনমোহন সিং আমাকে ফোন করে জানালেন যে বিহার অ্যাসেম্বলি ভেঙ্গে দেবার সুপারিশ করে ক্যাবিনেট একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমি প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ করে কিভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। প্রধানমন্ত্রী বললেন যে তিনি কল ব্যাক করছেন। মস্কো টাইম ১ টায় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে দ্বিতীয় বার ফোন পেলাম। আমি তার সাথে আলোচনা করার পর এটা বললাম। আমি ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের সাথে একমত না হলেও আমাকে রাজি করানো হবে। তাই আমি স্থির করেছি অ্যাসেম্বলি ভেঙ্গে দেবার।

এটা কোর্ট পর্যন্ত গড়ালো। বিহারের গভর্নর ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে দুটো রির্পোট পাঠিয়েছিল। একটা ২০০৫ এর ২৭ এপ্রিল আর একটা ২০০৫ এর ২১ মে। সংবিধানের ১৭৪ আর্টিকেলের ক্লজ ২ এর সাব ক্লজ (বি) এর বিধান মোতাবেক ২০০৫ এর ২৩ মে নোটিফিকেশন ইস্যু করা হয়। সংবিধানের ৩৫৬

আর্টিকেলের আওতাধীনে নোটিফিকেশন **জিএসআর ১৬২ (ই) ২০০৫ এর ৭ মার্চ পঠিত হবার পর বিহার** অ্যাসেম্বলি তাৎক্ষণিকভাবে ভেঙ্গে যায়। সুপ্রিমকোর্ট এই ইস্যুটির উপর অনেক যুক্তিতর্ক, মতামত আর আলোচনা শুরু করে। সুপ্রিম কোর্ট বিচারে এটাই নির্দেশিত করে যে ২০০৫ এর ২৩ মে তারিখের নোটিফিকেশন একটা চমৎকার মামলার অবতারণা করেছে। এই কোর্টে দাখিল করা আগের মামলাগুলোতে অ্যাসেম্বলি ভেঙ্গে দেবার বিধান জারি করা হয়েছিল যখনই ক্ষমতাশীল পাটি অ্যাসেম্বলি সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিল। বর্তমান কেসটি হচ্ছে নিজস্ব ধারার। লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির প্রথম মিটিং হবার আগেই অ্যাসেম্বলি ভেঙ্গে দেবার আদেশ জারী করা অবৈধ্য। এই ধারা অব্যাহত থাকলে সংবিধান লজ্জিত হবে। কোর্ট চারটি প্রশ্ন করলো :

১. প্রথম মিটিং অনুষ্ঠিত না হবার আগেই সংবিধানের আর্টিকেল ১৭৪ (২)(বি) ধারা মতে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ভেঙ্গে দেওয়া কি বিধিসম্মত?
২. ২০০৫ এর ২৩ মে তারিখে বিহার লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ভেঙ্গে দেবার ঘোষণা দেওয়া কি অবৈধ্য ও অসংবিধানিক নয়?
৩. যদি এই দুটি প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হয় তবে কি ২০০৫ এর ৭ মার্চ কিংবা ২০০৫ এর ৪ মার্চের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া উচিত নয়?
৪. আর্টিকেল ৩৬১ মতে গভর্নরের কি সুযোগ আছে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেবার?

সুপ্রিম কোর্ট এই ইস্যুর উপর বিতর্ক শুরু করলে নানা মতামত উঠে এলো। আমি পিএম কে বললাম যে পদ্ধতিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা সুপ্রিম কোর্টে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয় নি। এই কথাটা আমি তাকে একবার টেলিফোনে, আর একবার সামনাসামনিও বললাম। পিএম উল্লেখ করলেন যে তিনি আইনজীবীদেরকে বুঝিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি মস্কোতে থাকাকালে আমাদের অনেকবার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিয়েছিলেন। আমি আইনজীবীদের বুঝাতে পারলেও তারা কিন্তু আমার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন নি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা বিধান লঙ্ঘনের জন্য গভর্নর তথা সরকারকেই দোষারোপ করলো। মোটের উপর এর সব দায়দায়িত্ব আমার ও ক্যাবিনেটের উপর এসে বর্তালো।

রায়টা জানা মাত্র আমি একটি পদত্যাগপত্র লিখে উপরাষ্ট্রপতি ভোইরো সিং শেখোয়াতের কাছে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করে রাখলাম। তিনি একজন ঝানু রাজনীতিবিদ। আমি তার সাথে এ বিষয়ে আলাপ করে পদত্যাগপত্রটা তার হাতে দিতে চাইলাম। উপরাষ্ট্রপতি বাইরে ছিলেন। এক সময় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে পিএম আমার সাথে দেখা করতে চাইলেন। বিকেলের দিকে অফিসে আমরা মিলিত হলাম। আলোচনা শেষে আমি তাকে বললাম যে আমি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাকে আমার লেখা পদত্যাগপত্রটাও দেখালাম। আমি উপরাষ্ট্রপতি ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। প্রধানমন্ত্রী বিস্ময়ে চমকে উঠলেন।

সে মুহূর্তে যে অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা হলো তা আমি বর্ণনা করতে চাই না। প্রধানমন্ত্রী আমাকে বোঝালেন এই সংকটময় মুহূর্তে আমার পদত্যাগ করা উচিত নয়। তিনি আরো বললেন যে আমার পদত্যাগের ফলে এমন একটা ঘটনার উদ্ভব হবে যাতে সরকারেরও পতন ঘটে যেতে পারে। এই বিষয়ে আলোচনা করার মতো আর কেউ আমার নেই, শুধুমাত্র আমি আমার বিবেকের কাছেই বিষয়টা সম্বন্ধে জানাতে পারি। বিবেক হচ্ছে আত্মার আলো, আমাদের হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রজ্জ্বলিত থাকে। ওই রাতে আমি ঘুমাতে পারলাম না। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম বিবেকই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না জাতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । পরদিন সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে রোজকার মতো নামাজ পড়লাম। তারপর আমি ঠিক করলাম পদত্যাগপত্র দাখিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের যাতে সরকার বিপন্ন অবস্থায় না পড়ে।

দেশের খুব কম লোকই ই-গভর্ন্যান্স ব্যবহার সম্বন্ধে অবগত, যাকে আমি সীমান্তহীন জগত বলে মনে করি। আমি একে ভারত ও বিদেশের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে গড়ে তোলবার ইচ্ছে করেছিলাম। লোকজন ফাইল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি না করে ই-গভর্ন্যান্স এর মাধ্যমে অফিস আদালতের কাজ সমাধা করবে সেইটাও ছিল আমার বাসনা। বিহার অ্যাসেম্বলি (তা পড়ে কার্যকর হয় না) ভেঙ্গে দেওয়ার কাজটি কি আমার বিবেকের সিদ্ধান্ত ছিল!

≈

দান গ্রহণের বিরুদ্ধে মনু প্রত্যেক মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। দান গ্রহণ করলে গ্রহণকারীকে দাতার নিকট দায়বদ্ধ থাকতে হয়। তিনি বলেন, দান গ্রহণ করা খারাপ কাজের মধ্যে পড়ে।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, পার্লামেন্ট অ্যাক্ট ১৯৫৯ (অযোগ্যতা প্রতিরোধ) এ বলা হয়েছে সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ অফিস অব প্রোফিট গ্রহণ করতে পারবে না। তা পার্লামেন্টের সদস্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ২০০৬ এর মাঝামাঝি সাংসদদের কাছ থেকে আমি অভিযোগ পেলাম কতিপয় সদস্য অফিস অব প্রোফিট লাভ করছেন। আমাকে অভিযোগ সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে হলো। প্রয়োজনীয় তদন্ত করার জন্য আমি এই বিষয়টি চিফ ইলেকশন কমিশনারের কাছে পাঠালাম। এ সম্বন্ধে দু'জন সদস্যের কাছ থেকে অভিযোগ পেলাম। একজন হচ্ছেন মিসেস জয়া বচ্চন আর একজন হলেন মিসেস সোনিয়া গান্ধী, বিপুল সংখ্যক সদস্য আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কেন রাষ্ট্রপতি এই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। অনুমোদন প্রদানের জন্য এর মাঝে আমি অফিস অব প্রোফিট বিল পার্লামেন্ট থেকে পেলাম। আমি বিলটা পড়ে দেখলাম তার মধ্যে অনেক অস্বাভাবিকতা আছে। প্রস্তাবিত অফিস অব প্রোফিট বিল এ আমি খুঁজে পেলাম না কোন সিস্টেমেটিক অ্যাপ্রোচ যা থেকে বোঝা যায় অফিস অব প্রোফিট এর সংগা কী! শুধুমাত্র সাংসদের অধিকারে থাকা অফিসগুলো সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। আমার সাথে সংশ্লিষ্ট সুপ্রিম কোর্টের তিন জন বিচারকের সাথে অফিস অব প্রোফিট বিলের অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। আমি, আমার টিম ও ওই তিনজন বিচারকের সাথে পরামর্শ করে একটা পত্র প্রস্তুত করলাম। আমি মতামত দিলাম এই বলে যে অফিস অব প্রোফিট সম্বন্ধে খোলামেলা আর গ্রহণযোগ্য স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। রাজ্য ও ইউনিয়ন টেরিটোরিগুলোর ক্ষেত্রেও অফিস অব প্রোফিট সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

তারপর প্রশ্ন উত্থাপিত হলো আমার পত্রের ভিত্তিতে অফিস অব প্রোফিট ক্যাবিনেট কিংবা পার্লামেন্টে উপস্থাপন করতে হবে কিনা। আমি সংবিধানের আর্টিকেল ১১১ তে দেখলাম পুনর্বিবেচনার জন্য কোন বিলকে পার্লামেন্টে ফেরত পাঠানো যেতে পারে। অফিস অব প্রোফিট বিল ক্যাবিনেটের দ্বারা আমার কাছে অনুমোদনের জন্য আসবে না। অনুমোদনের জন্য আসতে হবে পার্লামেন্ট থেকে। যা হোক, আমি বিলটি পার্লামেন্টের উভয় হাউস লোকসভা ও রাজ্যসভার সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠালাম। এটাই ছিল পার্লামেন্ট কিংবা রাষ্ট্রপতিভবনের ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্রপতির কোন

বিলকে পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টে ফেরত দেওয়া। অবশ্যই পরদিন আমার পত্র পার্লামেন্টে ফেরত দেওয়া সম্পর্কে ইলেকট্রোনিক আর প্রিন্ট মিডিয়াতে লিড নিউজ হিসাবে প্রকাশিত হলো। এটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্যবিষয় হিসাবে লোকের মুখে মুখে ফিরলো। আমি শুধুমাত্র *মনু স্মৃতির* 'দান গ্রহণ করার ফলে একজন মানুষের স্বর্গীয় আলো প্রাপ্তির আশা নিঃশেষ হয়ে যায়।'এই বাণীর আলোকে প্রোফিট কিংবা গিফট এর অর্থ অনুধাবন করতে পারলাম। একটা হাদিসে বলা হয়েছে, 'যখন সর্বশক্তিমান একজন মানুষকে একটা অবস্থান দান করেন তখন তিনি তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। যদি কোন লোক এর বিনিময়ে কোন কিছু গ্রহণ করে তবে তা অবৈধ অর্জন বলে বিবেচিত হবে।'

অফিস অব প্রোফিটকে ফিরিয়ে দেওয়া আমার বিবেচনার বিষয়। বিলটি পুনর্বিবেচনা করে অনুমোদনের জন্য আমার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হলো। প্রধানমন্ত্রী আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরদিন আমি বিলটি স্বাভাবিকভাবে অনুমোদন করে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। আর কোন অজুহাত না দেখিয়ে বিলটিতে সহি করে পাঠিয়ে দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী বিস্মিত হলেন। আমি বললাম পার্লামেন্ট থেকেই কিছু করা প্রয়োজন। কোনকিছু করা হয়েছে কিনা তা আমি জানি না। প্রধানমন্ত্রী বললেন পার্লামেন্টে আমার মতামতের ভিত্তিতে অফিস অব প্রোফিট বিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি (জেপিসি) গঠন করেছে। অবশ্যই এই বিলের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট পূরণ সাপেক্ষেই আমি অনুমোদন দিয়েছিলাম।

এই ইস্যু সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য অনেক পার্টির প্রতিনিধিরা আমার সাথে দেখা করতে এলেন। আমি তখন উত্তর পূর্ব ভারত সফর করছিলাম। দিল্লির পথে কোহিমা থেকে বিমানে গৌহাটিতে পৌছিলাম। আমার সফরের প্রাক্কালে আমি অফিস অব প্রোফিট বিল পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্য জেপিসি গঠনের বার্তা পেলাম। কয়েক মাস পরে পার্লামেন্ট জেপিসি এর রিপোর্ট অনুমোদন করলো।

সম্প্রতি আমরা দুনীতির বিরুদ্ধে দুটো অনশন আন্দোলন প্রত্যক্ষ করলাম। এতে অনেকেই দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য অনুপ্রাণিত হলো। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম কেন আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ ধরনের আন্দোলনের প্রয়োজন পড়লো। বস্তুতপক্ষে, দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া পার্লামেন্টের নিজেরই দায়িত্ব। আমি মতামত প্রকাশ করতে চাই যে পার্লামেন্টকে ওয়াক আউট ব্যাতিরেকে দুর্নীতি সম্পর্কিত ইস্যুর উপর কমপক্ষে দু'সপ্তাহ আলোচনা করে সময় নির্ধারণ পূর্বক এজেন্ডা গ্রহণ করে জনজীবন

থেকে এই দুষ্টগ্রহকে নির্মূল করা উচিত। এরই অংশ হিসাবে সাংসদদের জন্য কোড অব কনডাক্ট প্রকাশ করা উচিত। যদি জনগণের প্রতিনিধিরা তাদের মিশন কার্যকর করতে ব্যর্থ হয় তবে জনগণ তাদের হতাশা ব্যক্ত করতে পারেই। প্রত্যেক রাজনৈতিক পার্টিকে নিজস্ব পন্থায় পার্লামেন্টের মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূল করতে হবে। পার্লামেন্টের উভয় হাউসের এগিয়ে আসার সময় এসেছে দুর্নীতি সম্পর্কিত ইস্যুগুলোকে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সমাধান করার। পার্লামেন্টের এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে নাগরিকদের মধ্যে আস্থা গড়ে উঠবে এবং ফলশ্রুতিতে সমাজে শান্তি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে, তাতে জাতির উন্নতি ঘটবে।

≈

রাষ্ট্রপতি হিসাবে আমার জন্য অধিকতর কঠিন কাজ ছিল আপিলের পরে কোর্টের দেওয়া সর্বোচ্চ শাস্তি প্রাপ্ত আসামীদের রাষ্ট্রপতির ক্ষমা ঘোষণা সম্পর্কিত। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কেস রাষ্ট্রপতিভবনে বেশ কয়েক বছর যাবত পেন্ডিং পড়ে আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মামলাগুলোর ফয়সালা করা রাষ্ট্রপতিদের একটা দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালন করতে কোন রাষ্ট্রপতিই খুশি ভাব দেখান নি। আমি ভাবলাম এই সমস্ত পেন্ডিং কেসগুলো সাধারণ নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অপরাধ খতিয়ে দেখবো। সর্বোচ্চ শাস্তি প্রাপ্ত আসামীদের ব্যক্তিগত সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা যাচাই করে দেখা যেতে পারে। আমি কেসগুলো স্টাডি করে দেখে বিস্মিত হলাম, অধিকাংশ পেন্ডিং পড়ে থাকা কেসই সামাজিক ও অর্থনৈতিক কলহের কারণে ঘটেছে। আমি অনুভব করলাম আমরা যে লোকটিকে শাস্তি দিতে যাচ্ছি সেই লোকটির প্রত্যক্ষভাবে ক্রাইম করার ইচ্ছে ছিল না। তবে একটা কেস দেখলাম, নি:সন্দেহে লোকটি মেয়েটিকে রেপ করে হত্যা করেছে। ওই কেসটিতে আমি দন্ডাদেশ বহাল রাখতে সম্মতি দিলাম।

≈

রাষ্ট্রপতির দায়িত্বগুলোর মধ্যে আর একটা দায়িত্ব সাধারণ নির্বাচনের পর দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগদান করা। স্থিতিশীল সরকার গঠন করতে একক পার্টি কিংবা কোয়ালিশন পার্টিগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের দরকার হবে। একাধিক দল থেকে সরকার গঠনের দাবি উত্থাপন করলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে

তখন সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। ২০০৪ এর নির্বাচনটা ছিল একটা মজার ঘটনা। নির্বাচন শেষ হবার পর ফলাফল ঘোষিত হলো। কোন পার্টিই সরকার গঠনের জন্য সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেল না। কংগ্রেস দল সবচেয়ে বেশি সিট পেল। এটা সত্ত্বেও তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। কোন পার্টি কিংবা কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য এগিয়ে এলো না। আমার কাছে বিষয়টা বিব্রতকর হয়ে উঠলো। আমি আমার সেক্রেটারিদেরকে বৃহত্তম দলের নেতার কাছে একটা পত্র পাঠাতে বললাম। এক্ষেত্রে কংগ্রেস এগিয়ে এসে সরকার গঠনের জন্য দাবি জানালো।

আমাকে বলা হলো যে সোনিয়া গান্ধী ১৮ মে ১২.১৫ টায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবেন। তিনি যথাসময়ে আসলেন, কিন্তু তিনি একা না এসে ড. মনমোহন সিংকে সাথে নিয়ে আসলেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিভিন্ন পার্টির সমর্থনের পত্রগুলো আমাকে দেখালেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানালাম। আপনাদের পছন্দ মত সময়ে আমি শপথ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারি। সোনিয়া গান্ধী আমাকে বললেন ১৯৯১ এর অর্থনৈতিক সংস্কারের স্থপতি ড. মনমোহন সিংকে প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনয়ন দান করছি। নিশ্চিতভাবে এটা ছিল আমার কাছে অবাক করা ব্যাপার। রাষ্ট্রপতিভবনের সেক্রেটারিয়েট প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগপত্র দেবার জন্য আবার কাজ শুরু করলো। তাকে নতুন সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো।

পরিশেষে, ২২ মে তারিখে সুসজ্জিত অশোকা হলে ড. মনমোহন সিং এবং ছিষট্টি জন মিনিস্টারের শপথ অনুষ্ঠান হলো।

গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুসম্পন্ন করতে পেরে আমি হাঁফ ছাড়লাম। সত্যি সত্যি তিন দিনের মধ্যে কোন পার্টি সরকার গঠনের দাবি না জানানোর জন্য আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম।

আমার আমলে আমি কঠিন কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। লিগ্যাল ও সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার মনকে পুরোপুরি দৃঢ় অবস্থায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলাম। আমার সিদ্ধান্তগুলোর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল আমাদের সংবিধানকে সমুন্নত রাখা।

১৪

রাষ্ট্রপতিত্বের পর

পুষ্পের দিকে তাকাও, কত স্বাচ্ছন্দ্যে সে তার সুগন্ধ আর মধু বিলিয়ে দেয়।
যখন তার কাজ শেষ হয়ে যায়, সে তখন নীরবে ঝরে পড়ে।
– ভগবদগীতা

রাষ্ট্রপতি হিসাবে আমার ব্যস্ততা ছিল। প্রথম বছরে আমার লক্ষ্য ছিল আমাদের সুন্দর দেশটার চারদিকে ভ্রমণ করা। সমস্ত রাজ্যে গিয়ে দেখা মানুষ কিভাবে তাদের পরিমন্ডলে সুখ দু:খের মাঝ দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। কেরালা উপকূলের ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে লাক্ষাদ্বীপ গঠিত। আমার বড় দু:খ আমি এই দ্বীপমালা সফর করতে পারি নি। অন্যান্য সব জায়গা আমি সফর করেছি একবার কিংবা একাধিকবার। প্রত্যেকটা এলাকাতেই নিজস্ব আকর্ষণ আছে। ভারতীয় হিসাবে সবার মধ্যেই সরলতা আর আতিথেয়তার মনোভাব আমি লক্ষ্য করেছি। অন্যেরা আমার এই সফরকে কী দৃষ্টিতে দেখেছিল সেটাই দেখবার বিষয়। আমি **আউট লুক** ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটা রিপোর্ট এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। 'কালাম একজন পরিব্রাজক রাষ্ট্রপতি, তার ১০ মাসের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পাবার পর তিনি এর মাঝেই ২১ টি রাজ্য সফর করেছেন। এটা বলতে দ্বিধা নেই অধিকাংশ রাষ্ট্রপতি এই কাজটা পাঁচ বছরে সম্পন্ন করতেন। এই সফরগুলোর মধ্যে ১৫ টারও অধিক প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত ছিল।...'

রাষ্ট্রপতিত্বের শেষ দিকে, আমি দুটো বিষয়ে হিসাব করে সন্তুষ্ঠ হলাম। আমি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের বিষন্নতা আর নিরাশার ভাব লক্ষ্য করি। আমি তাদের কাছে গিয়ে বলি তাদেরকে আস্থাশীল এবং কাজের প্রতি উৎসাহী হতে হবে।। কোন যুবককেই ভবিষ্যতকে ভয়ের চোখে দেখতে হবে না যখন ভারত সুন্দরভাবে প্রগতির পথে এগিয়ে

যাচ্ছে। ভারত উন্নত হবে, তোমাদেরও উন্নতি ঘটবে, আমি তাদেরকে বললাম। প্রকৃতপক্ষে, প্রবৃদ্ধির হার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধাপে ধাপে বাড়ছিল। আমার আমল শেষে যুবকদের মনোভাব ভিন্ন রকমের ছিল। তারা উন্নত ভারতে বসবাস করতে চাচ্ছিল। আর ভারতের উন্নয়নের জন্য কাজ করতেও তারা ইচ্ছুক ছিল।

লোকজন অবাক হতেন আমি কিভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকার মাঝেও বাইরের সাথে খাপখাইয়ে নিতে পারি। যা হোক, আমি রাষ্ট্রপতি হবার আগে আমি গভীরভাবে আমার লেখালেখি, শিক্ষাদান আর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদেরকে কাজে উদ্বুদ্ধকরণে ব্যস্ত ছিলাম। সে সময় আমাকে সেমিনার ও কনফারেন্সে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে হতো। আগের কাজগুলোতে ফিরে যেতে আমি ইচ্ছে করলাম। আন্না ইউনিভার্সিটি, চেন্নাই, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইআইআইটি), হায়দ্রাবাদ, পন্ত ইউনিভার্সিটি অব এ্যাগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি, পন্তনগর, দিল্লি ইউনিভার্সিটি; আইআইএম আহমেদাবাদ; আইআইএম, ইন্দোর; আইআইটি, খড়গপুর, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি (বিএইচইউ) এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আমার ডাক আসছিল।

২৬ জুলাই ২০০৭ থেকে আজ পর্যন্ত আমি আমার জীবনের মিশনকে মনশ্চক্ষুতে দেখতে পাই। আমার শিক্ষাদান ও গবেষণা কর্ম এখন পন্ত ইউনিভার্সিটিতে চালিয়ে যাচ্ছি। আমার দিকদর্শন হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদেরকে ভারতের সবুজ বিপ্লবের হাতিয়ার করা। পন্ত ইউনিভার্সিটি ভারতের প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশাল এলাকায় এক্সপেরিমেন্টাল ফার্মিং এর ব্যবস্থাযুক্ত এটা খুবই বড় একটা ক্যাম্পাস। খড়গপুরে ভারতের প্রথম আইআইটি, বিশিষ্ট প্রফেসর হিসাবে আমি শিখিয়েছিলাম লিডারসিপ এন্ড সোসাল ট্রান্সফরমেশন, হায়দ্রাবাদের আইআইআইটিতে আমি শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলাম ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড নলেজ প্রোডাক্টস সম্বন্ধে, যা ইন্ডিয়া ২০২০ ভিশনের সাথে সম্পর্কিত ছিল। বিএইচইউ আর আন্না ইউনিভার্সিটিতে আমি শিখিয়েছি টেকনোলজি এন্ড ইটস নন লাইনার ডাইমেনশন টু ট্রান্সফরম রুরাল ইকোনমি, আহমেদাবাদের আইআইএম এবং ইউনাইটেড স্টেটস এর লেক্সিংটন এর গাট্টোন কলেজ অব বিজনেস এন্ড ইকোনমিকস এ পড়িয়ে ছিলাম ন্যাশনাল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্স ডেভেলপমেন্টের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত একটা ইন্টার‍্যাকটিভ কোর্স। ছাত্রছাত্রীরা উন্নয়ন সম্পর্কিত আউট অব দি বক্স

আইডিয়া প্রদান করেছিল, যার টেন পিলার অব এ কমপিটেটিভ প্রোফাইল ২০২০ এর আগেই ভারতের জন্য অতি জরুরি ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একদল ছাত্রছাত্রী পিইউআর কে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারসিপ ভেন্‌চার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করছিল।

বিদেশ থেকে বহুসংখ্যক আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে আসার পর ইউনাইটেড স্টেটস, ইউনাইটেড কিংডম, ইন্দোনেশিয়া, নেদারল্যান্ড, রিপাবলিক অব কোরিয়া, ইসরায়েল, কানাডা, ফিনল্যান্ড, নেপাল, আয়ারল্যান্ড, ইউনাইটেড আরব আমিরাত, তাইওয়ান, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক ও শিল্পায়ন সমাজ থেকে আমন্ত্রণ লাভ করেছিলাম। সফর কালে আমি অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি ও রিচার্স ইনস্টিটিউট, শিল্পকারখানা পরিদর্শন করি। ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ কনফারেন্সেও যোগদান করি। আমি সব জায়গাই ভারতের উন্নয়ন মিশনের কথা ব্যক্ত করে তাদের কাছে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর মূল্যবোধ শিক্ষার জন্য অন্যান্য দেশের অংশীদারিত্বের আহ্বান জানাই। যতদূর মনে পড়ে, আমি ১২০০ এরও বেশি প্রোগ্রাম, মিটিং যোগদান করি এবং পনেরো মিলিয়ন লোক বিশেষ করে তরুণদের সাথে মিলিত হই। তরুণদের স্বপ্নগুলোকে আমি শেয়ার করি। আমি বুঝতে চেষ্টা করি তারা কিভাবে নিজেদেরকে অনুপম করে গড়ে তুলতে চায়, উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে তারা কেমনভাবে তাদের সাহস, শক্তি আর উদ্দীপনাকে কাজে লাগাতে চায়। সমস্ত চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করে তাদের এই কর্মযজ্ঞই উন্নয়নের ধারায় পৌঁছে দেবে ওয়ার্ল্ড ভিশন ২০৩০ সফল করতে।

এইসব ঘটনার প্রত্যেকটি আমার জীবনে একটা নতুন দিকদর্শন প্রদান করেছিল। আমি বিদেশ সফর করে কী কী শিখতে পেরেছি সে সম্বন্ধে আমি দেশে ফিরে এসে বিশ্লেষণ করতে লেগে পড়লাম। আমি আশার আলো দেখতে পেলাম সমস্ত দিকের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারলেই সমৃদ্ধ হবে সবার জীবন।

সবারই কথা কাজ আর কাজ। সব কাজকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে সময়ের প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, আমার সিডিউল যেন নিজেই প্রাণ পেল। এখন আগের চেয়ে আমার কাজ অনেক বেশি। আমি চিন্তা করলাম নিজের জন্য বেশি বেশি ভাববার প্রয়োজন নেই। একদিন আগে আমি আর. কে. প্রসাদের সাথে কথা বলেছিলাম। সে আমার সিডিউল এবং প্রোগ্রাম দেখা শোনা করতো। শুক্রবারে

আমি মইসোর থেকে ফিরে এসে সোমবারে মোরাদাবাদ ও রামপুর যাবার কথা ছিল। মাঝরাতে দিল্লিতে ফিরে আসার আগে চারটা অনুষ্ঠানে যোগ দেবার কথা। বুধবারে প্যান আফ্রিকান ই-নেটওয়ার্ক এ একটা ভাষণ দান, বৃহস্পতিবারে গৌহাটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করা, শুক্রবার রাতে দিল্লিতে ফিরে আসা, তারপর আবার শনিবার সকালে বিমান যোগে লাখনৌ যাত্রা ধর্মযাজকদের কনক্লেভ এ যোগদানের উদ্দেশ্যে। চলতি মে মাসের সিডিউল ছিল এমন :

সিডিউল ফর মে ২০১২

মঙ্গলবার, ১ মে

* বোকারো পরিদর্শন : বোকারো স্টিল প্ল্যান্ট পরিদর্শন এবং ইঞ্জিনিয়ারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, চিন্ময় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ।

* রাচি'র' হোয়াট ক্যান আই গিভ' প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ।

শনিবার ও রবিবার, ৫ ও ৬ মে

*চেন্নাই, ত্রিচি এবং কাড়াইকুডি সফর

সোমবার, ৭ মে

* গভর্নমেন্ট এসআর সেকেন্ডারি স্কুল, ছত্রিশগড় থেকে আসা ৩০ জন ছাত্র ও শিক্ষকের সাথে মিলিত হওয়া

বুধবার ৯ মে

* মথুরার সাংস্কৃতি গ্রুপ অব ইন্সিটিটিউট এর 'হোয়াট ক্যান আই গিভ' প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ।

* বৃন্দাবনের বিধবাদের জন্য নির্মিত পাগল বাবার আশ্রম পরিদর্শন

শুক্রবার ১১ মে

* সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে টেকনোলজি ডে উদ্বোধন

শনিবার ১২ মে

* ইউ পি'র আজমগড়ে বেদান্ত হসপিটাল উদ্বোধন এবং আজমগড়ের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ভাষণদান

মঙ্গলবার ১৫ মে
* ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ কর্পোরেশনের ২০১২ এর ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অব কো-অপারেটিভ উদ্বোধন

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ১৭ -১৮ মে
* সিএমআর ইন্‌স্টিটিউট অব টেকনোলজির গ্রাজুয়েশন ডে সেলিব্রেশনে প্রধান অতিথি
* মইসোর এ ডিফেন্স ফুড রিচার্স ল্যাব এর গোল্ডেন জুবিলীর অনুষ্ঠানে ভাষণদান
* অল ইন্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অব স্পিক এন্ড হেয়ারিং পরিদর্শন
* জেএসএস ইউনিভার্সিটি পরিদর্শন ও ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ভাষণদান

সোমবার ২১ মে
* তীর্থঙ্কর মহাবীর ইউনিভার্সিটি মোরাদাবাদ এর প্রথম কনভোকেশনে চিফ গেস্ট
* রামপুর পরিদর্শন, রামপুর জেলার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান
* সি.এল. গুপ্তা আই ইন্‌স্টিটিউট পরিদর্শন এবং ডাক্তার স্টাফদের উদ্দেশ্যে ভাষণদান
* মোরাদাবাদ ইন্‌স্টিটিউড অব টেকনোলজি পরিদর্শন এবং ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ভাষণদান

বুধবার ২৩ মে
* প্যান আফ্রিকান ই-নেটওয়ার্কে আফ্রিকান নেশনস এর উদ্দেশ্যে ভাষণদান

বৃহস্পতিবার ২৪ মে
* গৌহাটি সফর এবং আইআইটি গৌহাটি এর বাৎসরিক কনভোকেশনে ভাষণদান

শনিবার ২৬ মে
হিন্দুস্থান টাইমস হিন্দুস্থান ইউ পি এ ভাষণ, লাখনৌ এর ডেভেলপমেন্ট কনক্লেভে ভাষণ দান

অনুষ্ঠানগুলোর বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভাষণ দিতে হয়েছিল। বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ভাষণ তৈরি করা হয়েছিল।

≈

২৬ মে লাখনৌ কনক্লেভ এ উত্তরপ্রদেশের উন্নয়নের উপর মত বিনিময় করাই ছিল উদ্দেশ্য। স্বাভাবিকভাবে আমি আমার উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুত হলাম। বিশেষজ্ঞদের সাথে এবং নতুন চিফ মিনিস্টার অখিলেশ যাদবের সাথে আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবো বলে আমি খুশি হলাম। আটত্রিশ বছর বয়সী দেশের তরুণতম চিফ মিনিস্টার তিনি।

আর্থিক অগ্রগতিতে ইউপি দেশেরমধ্যে সবচেয়ে উচুঁ স্থানে। প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদে ইউপি খুবই ঋদ্ধ। ইউপিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দক্ষ তরুণ মানব সম্পদ হিসাবে বিশেষ অবদান রেখে আসছিল। আমার বিশেষজ্ঞ আমাকে জানালেন ২০১৬ এর মধ্যে বিশ্বের ১০০ দক্ষ চাকুরীজীবীদের মধ্যে প্রায় আটজনই আসবে এই রাজ্য থেকে।

ইউপি এর ইকোনোমিক প্রোফাইল পর্যালোচনা করে আমি জানতে পারলাম জনসংখ্যার ৭৩ পার্সেন্ট কৃষি এবং কৃষি সম্পর্কিত কাজের সাথে জড়িত। রাজ্যের ৪৬ পার্সেন্ট আয় আসে কৃষি খাত থেকে। ১১তম প্লান পিরিয়ডে রাজ্যের জিএসডিপি(গ্রোস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) ছিল ৭.৩ পার্সেন্ট, লক্ষ্যমাত্রা ৬.১ পার্সেন্টের চেয়ে বেশি। রাজ্যে ২.৩ মিলিয়ন ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট আছে। বর্তমানে ২.৫ মিলিয়ন তরুণ বেকার, তাদের মধ্যে ০.৯ মিলিয়নের বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি।

এই প্রেক্ষাপটকে মনে রেখে আমি বললাম বর্তমান পার ক্যাপিটা ইনকাম ২৬,০৫১ রুপি থেকে ১০০,০০০ রুপিরও বেশিতে উন্নিত করা প্রয়োজন। শিক্ষিতের হার ১০০ পার্সেন্টে উন্নিত করা দরকার। আইএমআর (ইন্টফ্যান্ট মোর্টালিটি রেট) ১০ এরও নিচে নামিয়ে আনা প্রয়োজন, তার সাথে সাথে লেপরোসি, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া চিকুনগুনিয়া, ডেঙ্গু এবং টিবির মতো রোগগুলোকে নির্মূল করতে হবে।

আমি বললাম এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ২০০ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান করতে হবে। আমার মতামতগুলোর মধ্যে আর একটা ছিল ইউপি মানুষের দক্ষতা জরিপ করা সম্পর্কিত। রাজ্যের সমস্ত জেলার বিভিন্ন ফিল্ডের মানুষের

যোগ্যতার মাপকাঠি যাচাই করা এই জরিপের অন্তর্ভুক্ত হবে। আমার ইচ্ছা ছিল ডাইনামিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজ্যের উন্নতি করা।

ইউনাইটেড স্টেটস ও ভারতের মধ্যে ইন্ডো-ইউএস নিউক্লিয়ার ডিল নামে ১২৩ এগ্রিমেন্ট চুক্তি সহি হয়।। এই চুক্তির অধীনে ভারত সিভিল ও মিলিটারী নিউক্লিয়ার সুযোগ সুবিধাকে পৃথক করতে এবং সমস্ত সিভিল নিউক্লিয়ার সুযোগ সুবিধাকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটোমিক এনার্জি এজেন্সি (আইএইএ) এর অধীন নিরাপদ করতে রাজি হলো। এর বিনিময়ে ইউনাইটেড স্টেটস রাজি হলো ভারতের সাথে সম্পূর্ণ সিভিল নিউক্লিয়ার কো-অপারেশনে। ইউপিএ (ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ এ্যালায়েন্স) সরকার দীর্ঘকালীন আলাপ আলোচনান্তে ২০০৮ এর ২২ জুলাই আইএইএ-এর সাথে সেফগার্ড এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরের আগে মুখোমুখি হলো আস্থা ভোটের ।

বামপন্থী দল বাইরে থেকে ইউপিএ সরকারকে সমর্থন দিয়ে আসছিল। এই চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধিতা করে সমর্থন প্রত্যাহার করলো। সমাজবাদী দলের প্রেসিডেন্ট মুলায়েম সিং যাদব এবং তার সহযোগী অমর সিং দু'জনেই সমর্থনের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হলেন। ডিল ভারতের জন্য অনুকূল হবে নাকি পশ্চিমারা বিশেষ করে ইউনাইটেড স্টেটস এর ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিল করবে এসব বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিলেন না। অবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য মুলায়েম সিং ও অমর সিং ১০ রাজাজী মার্গে আমার বাসভবনে সাক্ষাৎ করে এই ডিল এ ভারতের সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আমি তাদেরকে বললাম এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে থোরিয়াম ভিত্তিক নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর তৈরিতে ভারত ভবিষ্যতে আত্মনির্ভর হবে। তার অর্থ, আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য আমরা এনার্জি সেক্টরকে উন্নত করতে পারবো। বর্তমানে আমাদের সঞ্চিত ইউরেনিয়ামের জন্য ডিল আমাদের সহায়ক হবে।

একবার তামিলনাড়ুর কুনদানকুলামে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠে, বিশেষ করে ২০১১ তে জাপানের ফুকুসীমাতে সুনামী আঘাত হানলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিও দ্বারা সমর্থিত স্থানীয় গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করে। তারা দাবি করে কুনদানকুলামের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের কাজ তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করতে হবে। তারা ইঞ্জিনিয়ারদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দেয়। মারাত্মক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমি ভারতে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে একটা স্টাডি করে তার ফলাফল প্রকাশের জন্য

এগিয়ে আসি। এ বিষয়ে ইংরেজি খবরের কাগজে ও স্থানীয় খবরের কাগজেও তা প্রকাশ করি। আমি আমার আর্টিকেলে তুলে ধরি উন্নয়নের জন্য কেন এই টেকনোলজির প্রয়োজন।

এর পাশাপাশি আমি আমার টিম সাথে নিয়ে ২,০০০এম.ওয়াট থার্ড জেনারেশন প্লাস প্লান্ট পর্যবেক্ষণ করতে কুনদানকুলামে যাই । আমি বুঝতে চেষ্টা করি কেন স্থানীয় লোকজন জাপানের ফুকুসীমার সুনামীর ঘটনাকে এর সাথে সম্পৃক্ত করছে। আমি সারাদিন বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় লোকজনদের সাথে মিলিত হই এবং এই প্লান্ট থেকে প্রথম পর্যায়ে কী কী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে স্টাডিও করি। আমি একটি নোট থেকে নিশ্চিত হই যে এটাতে সর্বশেষ টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, ফলে এটা নিরাপদ। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের নিরাপত্তা সম্পর্কে চারটি বিষয় যাচাই করার প্রয়োজন দেখা দেয়। স্ট্রাকচারাল ইন্ট্রিগ্রিটি সেফটি, থারমাল হাইড্রোলিক সেফটি, রেডিয়েশন সেফটি এবং নিউট্রোনিক সেফটি। এই প্লান্টে এই চারটি সেফটিই সুরক্ষিত আছে। পরে আমি মতামত দেই যে প্লান্ট সংলগ্ন গ্রামবাসীদের শিক্ষা ,স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ এবং বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য সেখানে একটি বিশেষ পিইউআরএ কমপ্লেক্স স্থাপন করা উচিত।

আমার প্রস্তাবিত বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হয়েছে জেনে আমি খুশি হই। সরকার ঘোষণা করলো পাওয়ার প্লান্টের লভ্যাংশের ২ পার্সেন্ট কুনদানকুলাম এলাকার লোকজনদের কল্যাণে ব্যয় হবে । প্লান্ট চালু হওয়ায় এনার্জি সেক্টরের অগ্রগতির দ্বার উন্মোচিত হলো।

গত পাঁচ বছরে আমি লক্ষ লক্ষ শিশু ,তরুণ আর জ্ঞানীগুণিদের সাথে মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি দেশ ও বিদেশের বহুমুখী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক এবং রিচার্সমূলক কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগও পেয়েছিলাম । একজন শিক্ষক হিসাবে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের কাছে ন্যাশনাল ইস্যুর আলোকে সমাজকে গড়ে তোলার সুযোগ আমার ঘটেছিল। সর্বপরি আমি আটটিরও অধিক রাজ্যে ইমার্জেন্সি ট্রাউমা ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে লাইভ সেভিং সিস্টেমকে পরিচিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলাম।

উপসংহার

ওহ! সাংসদগণ, ভারত মাতার ভাস্করগণ,
আমাদেরকে আলোর দিকে চালিত করো, আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করো।
তোমাদের সৎ পরিশ্রম আমাদের আলোকবর্তিকা হোক,
যদি তোমরা কঠিন পরিশ্রম করো, তবে আমরা সবাই সমৃদ্ধির মুখ দেখবো।

২০০৭ এ আমি অফিস ছেড়ে আসার আগে সাংসদদের সামনে আমি একটা ভাষণ প্রদান করেছিলাম। আমি বলেছিলাম আমার অনুভব অতি প্রাসঙ্গিক যা আমি আগেও বলেছি, কয়েকটা পয়েন্টও উল্লেখ করেছিলাম সেগুলো মনে রাখা প্রয়োজন। ভারতের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা স্বাধীন দেশ হিসাবে বিশ্বাসের বলে বলিয়ান। ১৯৫১ এ এই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবিধানের বিধিবিধানে জাতীয় ঐক্য, জাতীয় নিরাপত্তা, সমৃদ্ধির কথা ব্যক্ত করা হয়। একটা জাতি হিসাবে, আমরা যে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছি বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা নি:সন্দেহে আশাব্যঞ্জক। আমাদেরকে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। আমাদের জনগণের উন্নতির জন্য উন্নয়নের রূপকার হিসাবে নেতাদেরকে লড়াই করার জন্য একটা নতুন ভিশনকে সামনে রেখে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। উজ্জীবনী শক্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে আমরা পৃথিবীর উন্নয়নের জন্য লড়াই চালিয়ে যাব।

পার্লামেন্ট নিঃসন্দেহে ভারতের সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান, প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের প্রতীক। জাতীয় রাজনীতিতে সংসদীয় গণতন্ত্রই হচ্ছে সরকার পরিচালনার বিশেষ পদ্ধতি, যার মধ্যে ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক ধারার অনুষঙ্গ সুষ্ঠুভাবে প্রতিভাত। এই স্বাধীন প্রতিষ্ঠানকে টেকসই করার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক অংশীদারিত্বকে বিস্তারিত করার সুযোগ আছে। যা হোক, আমার মনে হয়, একুশ শতাব্দীর উষালগ্নে আমাদের মহান প্রতিষ্ঠান পার্লামেন্ট অধিকতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি যা ১৯৫১ এ এই প্রতিষ্ঠানটি জন্ম নেবার পর কখনো ঘটে নি।

আমরা যা পরিষ্কারভাবে দেখছি সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের

অভাব লক্ষ্যণীয়। এই কারণেই যে চ্যালেঞ্জগুলো জাতির সামনে উপস্থিত সেগুলোকে মোকাবিলা করে আমি দেশকে ২০২০ এর মধ্যে উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করা জরুরি বলে মনে করি।

এখানে একটা বড় ধরনের আবেগ আর উপলব্ধি মনে জাগে যে ভারতের সরকার পরিচালনার অন্তর্মুখী আর বহির্মুখী পরিবেশ অতি দ্রুত আর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অখণ্ডনীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে বিশেষ করে গত দুই দশকে। চ্যালেঞ্জগুলো জাতীয় সার্বভৌমত্ব, সংহতি আর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির উপর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বর্তমান সময়কালে জটিলতা বৃদ্ধি পাবার ফলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবক্ষয়ের প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। সামাজিক আস্থার ক্ষেত্রে ভারতের শাসন পদ্ধতির উপর এক ধরনের সংকট দেখা দিচ্ছে।

সরকার ও পার্লামেন্টে যোগ্যতাসম্পন্ন ক্ষমতাবান, ও আশাবাদী নেতাদের উপস্থিতির জন্য ভারত সৌভাগের অধিকারী । স্বাধীনতার পর থেকে অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের বহুমুখী অর্জনের জন্য গর্ব করতে হয়। অনেকেই আশা করেন ২০৫০ এর মধ্যে ভারত বিশ্বের মধ্যে অর্থনীতিতে উচ্চ শিখরে উঠার ক্ষমতা অর্জন করবে। কিন্তু গণতন্ত্র কিংবা অর্থনৈতিক পুনরুত্থান ছাড়া তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অবিরত নজরদারী হচ্ছে মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায়। এটা সম্ভব গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও সুষ্ঠু কার্যপদ্ধতির উপরই। আমরা অতীতের অর্জনগুলোকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকতে পারি না, আবার সাম্প্রতিক উন্নতিকেও ঠেলে ফেলে দিতে পারি না। সাম্প্রতিক উন্নতিই জানান দিচ্ছে এই পথেই আমরা আমাদের সমাজ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারি এবং পাবলিক সেক্টরের বাইরেও ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে । আমাদের পাবলিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্জীবন দানের মাধ্যমেই একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করাই এখন আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ।

সরকারি এবং পাবলিক সেক্টরের সর্বস্তরের আউটপুট সেভিং ও পাবলিক সেভিংয়েই শুধুমাত্র আমাদের উন্নতি যাচাই করলেই হবে না, গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক সার্ভিস যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রেরও অগ্রগতি যাচাই করতে হবে। বহু সংখ্যক প্রখ্যাত পন্ডিত ব্যক্তিও পার্লামেন্টের কার্যবিধির উপর পড়াশোনা করে থাকেন। ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট কোন কোন বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করে থাকে তা তারা পর্যালোচনা করে থাকেন।

আমি যত্ন সহকারে ওইগুলোর উপর রিভিউ চালিয়ে দেখেছি যে তাদের বেশ কয়েকজনের মতামতের গুরুত্ব আছে ।

জাতির উন্নয়নের জন্য পার্লামেন্টের কার্যকারিতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পার্লামেন্ট হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান অবশ্যই তার গ্রহণযোগ্যতা ও দায়দায়িত্ব আছে। সরকারি কাজকর্মের জন্য পার্লামেন্টকে অনেক সহযোগী ক্রিয়াকর্ম করতে হয়। উদাহরণ হিসাবে মোশনস অন দি ফ্লোর, ওভার সাইটিং পাওয়ার এবং কমিটি সিস্টেমের কথা বলা যায়। এই সহযোগী ক্রিয়াকর্মকে আরো জোরদার করা প্রয়োজন। আসল সত্যটা হলো ভারতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হলে গ্লোবালাইজিং করা একান্ত প্রয়োজন। ঋদ্ধ জাতি হিসাবে দুটো ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর তদারকির কারণে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে । *বিশ্বের পার্লামেন্টগুলোর মধ্যে ভারতীয়* পার্লামেন্ট অন্যতম একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

অনেক রাষ্ট্রের মতো ভারতরাষ্ট্রও রেগুলেটোরি নেটওয়ার্ক ইলেকটেড ইন্‌স্টিটিউটস এর সাথে ক্ষমতা আদান-প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্নির্মাণ করেছে । কয়েক বছর ধরেই এই বিধান বলবত আছে। ফলশ্রুতিতে স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পার্লামেন্টারি সিকিউরিটি বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্লামেন্টের কাজের পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন সাংসদদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে বিশেষ করে নতুন ও তরুণ সাংসদদের ক্ষেত্রে। সাংসদদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রথম লোকসভায় পাঁচটা রাজনৈতিক দল ছিল, আর চৌদ্দতম লোকসভায় রাজনৈতিক দলের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকসভায় রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বেশি হওয়ায় একটা সুবিধাও আছে। এ থেকে পার্লামেন্টে এবং নিজ নিজ পার্টিতে তাদের কাজের পরিধিকে বিস্তৃত করা সম্ভব হয়। সমষ্টিগত কাজের ফলে বাধা দূর হয়।

সাংসদরা পৃথক পৃথকভাবে পার্লামেন্টে ভালো কাজের দ্বারা সচেতনভাবেই পরিচিতি লাভ করেন এবং তাদের কন্‌স্টিটুন্সেসিতে রাজনৈতিকভাবে পুরস্কৃত হন, তা সেটা রাজনৈতিক দলই হোক বা কোয়ালিশনের ক্ষেত্রেই হোক। এতে তাদের মধ্যে ভালো কাজ দেখানোর উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতা লাভের পরের প্রথম দিকের দিনগুলোতে উত্তম পার্লামেন্টারি পারফরমেন্স দেখানোর নজির

আছে। পার্লামেন্টকে আবারও সক্রিয় সরব হতে হবে এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অর্থনীতি, সামাজিক পলিসিকে সমন্বিত প্রয়াসের দ্বারা গ্লোবাল ইকোনমিকে জোরদার করতে হবে। পার্লামেন্টের কণ্ঠস্বরকে জোড়ালো করার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত কোন উপাদান নাই। ইতিবাচক উৎসাহ, ভিশনারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করবে সাংসদদেরকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জিং এর জবাব দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সাংসদদের এগিয়ে আসার মাধ্যমেই।। প্রখ্যাত ব্যক্তিরা মতামত ব্যক্ত করেছিলেন কয়েক বছর পার্লামেন্টকে নিবিড়, পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। কেউ কেউ বলেছিলেন প্রস্তাব বাস্তবায়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

১. রাজনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে

এ . ছোট পার্টির দ্বারা কোয়ালিশন সরকার অস্থিতিশীলের ভয় প্রতিরোধ করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। তার সাথে সাথে কোন পার্টি থেকে এক বা তার বেশি সদস্য দলত্যাগ করা রোধ করতে হবে। (ছোট পার্টির ক্ষেত্রে লোকসভায় ১০ কিংবা ১৫ সদস্য থাকতে হবে।) একবার কোয়ালিশনে যোগ দিয়ে তা প্রত্যাহার করে নিয়ে অন্য দলে যোগদান করা রোহিত করতে হবে আইন করে।)

বি. যখন সমস্ত পার্টি মিলে কোয়ালিশন গঠিত হবে তখন তার পার্লামেন্টারি কার্যবিধি পরিচালনার জন্য একটা সিঙ্গেল পার্লামেন্টারি পার্টি থাকতে হবে।

সি. মিনিস্টারিগুলোর বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা থাকতে হবে। মিনিস্টারদেরকে ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যই ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

ডি. সাংবিধানিক সংশোধনী মেজরিটি পার্টির সম্মতিতে করতে হবে।

ই. নির্বাচনের জন্য পাবলিক ফান্ডিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

এফ. হাউস ছাড়া লেজিসলেশন করা যাবে না।

জি. 'ভয়েস ভোট' অনুমোদন করা যাবে না ।

এইচ. স্পিকার / চেয়ারম্যানকে ম্যান্ডেটের দ্বারা হাউসে বারবার বিরক্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে সাসপেন্ড কিংবা বহিষ্কার করতে পারবে।

২. প্রশাসনিক ক্ষেত্রে

এ. কেন্দ্রিয়করণ : অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য স্টেট থেকে কেন্দ্রে পাওয়ার ট্রান্সফার করতে হবে।

বি. বিকেন্দ্রিয়করণ : কেন্দ্র থেকে রাজ্যে ফাইন্যান্সিং ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামগুলোকে ট্রান্সফার পাওয়ার এন্ড রেসপসিবিলিটি দিতে হবে।

সি. একটা কেন্দ্রীয় কমিশন স্থাপন করতে হবে সমস্ত রকমের কেন্দ্রীয় সাহায্য সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য।

ডি. ইউপিএসসি এর মতো বিশেষায়িত বডি গঠন করতে হবে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, রেগুলেটরি বোডি এবং পাবলিক এন্টারপ্রাইজ, ব্যাংক, আর্থিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কালচারাল ইনস্টিটিউট এ।

ই. সরকারের আওতাধীনে প্রাইভেট সেক্টরে জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার করতে হবে ।

এফ. জরুরি ভিত্তিতে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বাৎসরিক ফিজিকাল সার্ভিসে।

জি. প্লানিং কমিশনকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

এইচ. মিনিস্টার লেভেলে দূর্নীতি রোধের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

আই. পরিশেষে, জুডিশিয়াল ক্ষেত্রে লিগ্যাল সিস্টেম সংস্কার সাধনের জন্য কোন ক্রমেই কালক্ষেপন করা যাবে না।

পার্লামেন্টের থাকতে হবে নতুন রূপকল্প ও নেতৃত্ব শুধুমাত্র আমাদের জাতিকে আলোকিত, ঐক্যবদ্ধ, একসূত্রে গাঁথা আর সুখ ও সমৃদ্ধি নয়। একটা জাতি হিসাবে দারিদ্রসীমা অতিক্রম করে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে যখনই ভারত পৌঁছাতে পারবে তখনই ইন্ডিয়া ২০২০ ভিশন সার্থক হবে। যদি পার্লামেন্ট আজকে এই মিশনকে সফল করার জন্য কাজ করে তবেই ২০২০ সালে ভারত উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে শক্তিশালী হবে এবং তাহলেই ভারত সুখী সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হতে পারবে। ইন্ডিয়া ২০২০ মিশনের চ্যালেঞ্জগুলোকে উপলব্ধি করে গভার্ন্যান্স ও লেজিসলেটিভ ক্রিয়াকলাপ যথাযথভাবে পরিচালিত হওয়া একুশ শতাব্দীর জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। টেকনোলজিকাল রেভুলেশন, ন্যাশনাল ও গ্লোবাল কানেকটিভিটিকে কার্যকরীভাবে গ্রহণ করা একান্তই প্রয়োজন। পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ অবশ্যই এই সববিষয়ে যুক্তিতর্কের সাহায্যে সৌহার্দপূর্ণ নেতৃত্বের দ্বারা জাতির জন্য এই ভিশনটাকে বাস্তবায়িত করতে পারেন, এই উদ্দেশ্য সাধনের কথাই সংবিধানে উল্লিখিত আছে ইন্ডিয়া ২০২০ ভিশনে। ভারতের জন্য একুশ শতাব্দীর পার্লামেন্টারি ভিশনটা হচ্ছে গ্লোবাল ধ্যানধারণার ভিত্তিতে তৈরি করা কলাকৌশল, সমন্বিত কাঠামো আর কাজের পরিকল্পনা । ভারত যদি ২০২০ এর মধ্যে ন্যাশনাল প্রোসপারিটি অর্জন করতে পারে তবে ২০৩০ এর আগেই ভারত উন্নত রাষ্ট্রের পর্যায়ে উন্নিত হবে।। এটাই হচ্ছে পার্লামেন্টারি ভিশন। এর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কোটি কোটি মানুষের মুখে হাসি ফোটানো সম্ভব। আমাদের পার্লামেন্টারিয়ানদেরকে আজ সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে যাওয়া প্রয়োজন। আপনারা আমার সাথে এই বিষয়ে একমত হবেন যে এটা হচ্ছে আমাদের পার্লামেন্টারিয়ানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিশন।

দুর্নীতি, গভার্ন্যান্স এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে পার্লামেন্টকে সদা জাগরুক থেকে জরুরি ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন করতে হবে।

অত:পর

আচার্য মহাপ্রাজ্ঞ সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত সদাসর্বদাই আমার মনে অনুভূত হয়েছিল যে নিউক্লিয়ার ওয়েপন তৈরি করে মহান মানব জাতির বিরুদ্ধে কী যে কাজ করেছি! আচার্য মহাপ্রাজ্ঞ জ্ঞানের বিশাল আধার । যে তার সাক্ষাৎ লাভ করেছে তার আত্মাই পরিশুদ্ধ হয়েছে। ১৯৯৯ এর অক্টোবর মাসের এক মাঝরাত, আচার্য তার শিষ্যদের সাথে জাতি ও মানুষের কল্যাণে প্রার্থনা রত ছিলেন। প্রার্থনা শেষে তিনি আমার দিকে ফিরে আমাকে যা বললেন তাতে আমার মন প্রসন্ন হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, 'কালাম, তুমি তোমার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে যা করেছ তার জন্য ঈশ্বর তোমাকে মঙ্গল করবেন। সর্বশক্তিমান তোমাকে দিয়ে বিশাল কাজ করাবেন। তুমি কেন আজ এখানে এসেছো? আমি জানি আজ আমাদের দেশ নিউক্লিয়ার নেশন হিসাবে গড়ে উঠেছে, আর তুমি যা করেছো তা অন্য কোন মানুষ কখনো করতে পারে নি। বিশ্বে নিউক্লিয়ারিং ওয়েপনের আজ জয়জয়কার। আমার অনুরোধ তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে বিশ্বশান্তির জন্য নিবেদিত হও যাতে নিউক্লিয়ারিং ওয়েপন অকার্যকর, গুরুত্বহীন আর রাজনৈতিকভাবে অনুপোযোগী হয়ে উঠে।'

আচার্য তার বক্তব্য শেষ করার পর হলঘরটাতে নীরবতা নেমে এলো। আমি আমার জীবনে এই প্রথম এই অনুরোধ শুনলাম, যা থেকে আমার মনে যেন এক ধরনের অনুরণনের সৃষ্টি হলো। তারপর থেকে আচার্যের সেই বার্তা আমার জীবন চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসাবে দেখা দিল। এটা ছিল একটা বাস্তব চ্যালেঞ্জ, যা আমার জীবনে নতুন দিশা দেখালো।

≈

আমি প্রথম অধ্যায়ে একজন তরুণী মেয়ের কথা বলেছি, যা থেকে আমি বিস্ময়াবিভূত হই। মেয়েটিকে দুরাবস্থা থেকে বাঁচাতে পেরে আমি খুশি হয়েছিলাম। আমি যাকে তাদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলাম তিনি ছিলেন একজন ব্যাংকার। তিনি মেয়েটির পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেন। তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করতে সচেষ্ট হন। পরবর্তীজীবনে মেয়েটির ভালো বিয়ে হওয়ায় সে ঘরসংসার করে সুখী হতে সক্ষম হয়। তার দু'একটা স্বপ্ন সার্থকতার মুখ দেখতে পাওয়ার খবরে আমরা খুশি হই।

পরিশিষ্ট -১

সাক্ষাৎকার

২০০৬ এ কয়েকটি রাজ্য সফর শেষ করে মিজোরামে পৌঁছালে এনইটিভি এর মনোরঞ্জন সিং আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। আমি কয়েকটি ইস্যু, বিষয় এবং কাজকর্মের উপর সাক্ষাৎকার দেই।

১. এই রাজ্যে আপনার উন্নয়ন মিশন অনুযায়ী যে কাজ চলছে তার উপর কি মনিটরিং করা হচ্ছে? ফলপ্রসূ মনিটরিং এর ব্যবস্থা কি আছে?

অভিজ্ঞতার আলোকে আমি রোডম্যাপ করে দিয়েছি। প্লানিং কমিশন, রাজ্য সরকার, সেন্ট্রাল মিনিস্টারির স্বাধীন মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে কাজ চলছে। আমার টিম বিনিদ্র রজনীযাপন করে উপস্থাপনা প্রস্তুত করেছে। আমি গুরুত্ব সহকারে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করার ব্যবস্থা নিয়েছি। অংশগ্রহণকারী সদস্যদেরকে আমার মিশনের উপর আলোচনার সুযোগ দান করেছি। আমার উপস্থাপনার পরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাজ্য অ্যাসেম্বলি আমার প্রস্তাবিত মিশন বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি রাজ্য সফর কালে বিশ্ববিদ্যালয়, চেম্বার অব কমার্স, অন্যান্য ব্যবসায়ী মহল এবং চাকুরীজীবী সম্প্রদায়ের কাছে আমার বক্তব্য তুলে ধরেছি। আমি সর্বদাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মিশনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের কথা ব্যক্ত করেছি। উদাহরণ হিসাবে, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, বিহার মিশনের উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাজ চলেছে। কেরালাতে মিডিয়া এ সম্বন্ধে সরকার, বুদ্ধিজীবী এবং সংশ্লিষ্টদের

সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়েছে। মিশন বাস্তবায়নের জন্য তারা অ্যাকশন প্লান গ্রহণ করেছে। এই সূত্রে মিডিয়াও সরকারের অন্যতম অংশীদার হয়েছে। আমি উত্তরপূর্ব ভারতের সিকিম, মিজোরাম,অরুণাচল প্রদেশ এবং মেঘালয়েও মিশনের কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা করেছি। এই রাজ্যগুলো বিশেষভাবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কৃষির ক্ষতিরোধ কল্পেও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

২. বাৎসরিক ও পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পের বাইরেও কি আপনি রোডম্যাপ দিয়েছেন? এই দুই প্রকল্পের মাঝে কি বিরোধ আছে?

আমরা যখন রোড ম্যাপ তৈরি করেছিলাম তখন সমস্ত মন্ত্রণালয়, রাজ্য সরকার এবং প্লানিং কমিশনের কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে তথ্য-উপাত্ত নিয়েছিলাম।। প্লানিং কমিশনের দ্বারা আটটা ক্রাইটেরিয়ার উপর একটা ডেভেলপমেন্ট রাডার প্রস্তুত করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ডেভেলপমেন্ট রাডার প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন কম্পিটেন্সের লক্ষ্যে পৌছানো যাতে উন্নয়ন দ্রুততর করা যায়। আমাদের মিশনগুলোর ভিত্তি ছিল রাজ্যের কোর ও প্লানিং কমিশনের পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পের সম্পূরক। আমাদের মিশনের প্রকল্পগুলো ছিল দীর্ঘ মেয়াদী। ২০১৫-এর আগে উন্নয়নের অগ্রগতি লক্ষ করা যাবে না। ২০২০-এর মধ্যেই রাজ্যগুলো উন্নয়নের গন্তব্যে পৌছে যাবে।

৩. রোড ম্যাপগুলো তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে আপনার বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান, আপনার ভিশন আর বিজ্ঞান ও টেকনোলজির বাস্তব জ্ঞান। আপনার সাফল্য কি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি নয়?

আমি ব্যক্তিগতভাবে যেকোন ভালো সিস্টেমের প্রতি আস্থাশীল। ভালো কিছু অবশ্যই টিকে থাকে। গত পাঁচ বছরে আমি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রত্যক্ষ করেছি। আরো কয়েকটা সাফল্যও আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমি মনে করি, এর

কারণ কয়েকটা স্টেট অ্যাসেম্বলি উন্নয়ন মিশন সম্পর্কে আমাকে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছিল। আমি যখন এক দুইটা অ্যাসেম্বলিতে এই আলোচনা শুরু করি, অন্য অ্যাসেম্বলি থেকেও ডাক আসে তাদের অ্যাসেম্বলিতে বক্তব্য পেশ করার জন্য। এ থেকে আমি দেখতে পাই যে ভারতীয় জনগণ ভারতীয় রাজনৈতিক সিস্টেমের প্রতি আস্থাশীল হতে শুরু করেছে । দেশের উন্নয়নের জন্য মিশন ভিত্তিক প্রোগ্রামগুলোর প্রতিও আস্থাশীল হতে শুরু করে।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করি, অ্যাসেম্বলিগুলোতে সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির অফিসের একটা প্রফেশনাল টিম থাকা প্রয়োজন। অবশ্যই এটাকে আপনারা বলতে পারেন রাষ্ট্রপতি অফিসের নতুন একটা উদ্যোগ। এটা নি:সন্দেহে একটা জাতীয় মিশনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা।

৪. সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা এবং সরকারের দায়দায়িত্বের মধ্যে সুরক্ষার কথা বলা থাকলেও গত চার বছরে আপনি কি অনেক এলাকায় তা লঙ্ঘিত হওয়ায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বৈরিতা লক্ষ্য করেন নি?

সিস্টেমটা খুবই ভালো। এর ফলে উভয়কে মিলেমিশে কাজ করার সুযোগ আছে। উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার সমস্যার উদ্ভব যদি না থাকে কোন ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্রকে বড় করে দেখা হয়।। দুটো গভার্নরের কনফারেন্স রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মাঝে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিতে লক্ষ করা যায়।

৫. আপনার মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল যখন আপনার সহি করার জন্য আপনার আপত্তিকৃত বিল আপনার কাছে ফিরে এসেছিল?

অফিস অব প্রফিট বিল সংক্রান্ত ইস্যুগুলো ছিল পরিষ্কার । আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সংবিধানের বিধিবিধান অনুযায়ী। আপনি লক্ষ্য করবেন যে পার্লামেন্টের উভয় হাউসের দ্বারা জেপিসি গঠনের সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে পুনরায়

পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। জনসাধারণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর সাধারণ মনোভাব ছিল আমাদের পক্ষে। জেপিসি গঠন করে পার্লামেন্টের সদস্যদের প্রফিট অব বিল এর সংগা প্রদান করার শর্তের গাইড লাইন পূরণ সাপেক্ষে আমি বিলে সহি করেছিলাম।

৬. আপনার প্রিয় ক্ষেত্র সায়েন্স ও টেকনোলজি । বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য আপনি তরুণদের মনকে জাগরিত করার জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থানে ক্যাম্পেন করেছেন, আপনার মতের সাথে মিলিয়ে সরকারের কি নতুন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

এ. সম্পূর্ণ প্রাথমিক আর সেকেন্ডারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিশুদেরকে সৃজনশীল করে গড়ে তোলার উপযোগী করে গড়তে হবে। অবশ্য রাজ্যের লেজিসলেটরদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পার্লামেন্ট শিক্ষা অধিকার বিল পাশ করেছে। বস্তুতপক্ষে, শিক্ষা অধিকার বিলে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার বিধান রাখা হয়েছে।

বি. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন। সৃজনশীল সিলেবাস তৈরি করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় বিশেষজ্ঞদলকে নিয়োগ করতে হবে । সৃজনশীল ক্লাস আর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৃজনশীল শিক্ষক নিয়োগও করতে হবে।

সি. ইন্ডিয়া ২০২০-এর আলোকে সায়েন্স ও টেকনোলজিকে সামনে নিয়ে আসা উচিত হবে।

ডি. বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম রচিত হবে অবশ্যই গবেষণামূলক, তথ্যভিত্তিক, সৃজনশীল আর আবিষ্কারমুখী। তরুণদের মধ্যে উচ্চ

প্রযুক্তি, শিল্প-বাণিজ্য উপযোগী এবং নৈতিক নেতৃত্বদানকারী হিসাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা ইন্ডিয়া ২০২০ এ তাদের অবদান রাখতে পারে।

ই. প্রতি বছর প্রায় ১,০০০ তরুণ ছাত্রছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করতে হবে তাদের পেশাগত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সায়েন্টিফিক রিচার্স কর্মে নিয়োজিত করার জন্য, আর তা হলেই তারা সায়েন্স ক্যাডার হিসাবে গড়ে উঠবে।

৭. উদাহরণ হিসাবে বলতে হয় মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য প্রার্থী সংখ্যা বিপুল, অথচ বেসিক সায়েন্স কোর্সগুলো চলে ছাত্রছাত্রী ছাড়াই। ছাত্রছাত্রীদেরকে কি বেসিক সায়েন্স আর রিসার্চে উৎসাহিত করা উচিত নয়?

এ বিষয়ে আপনাকে অবগত করা যেতে পারে যে সরকার দুটো রাজ্যে ইনস্টিটিউশন অব সায়েন্স, রিচার্স এন্ড এডুকেশন কার্যক্রম শুরু করেছে। আমরা প্রয়োজন বোধ করছি গ্লোবাল হিউম্যান রিসোর্স ক্যাডার গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ নেবার। তরুণদের জন্য সায়েন্স, টেকনোলজি এবং রিসার্চে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যাতে ২০৫০ এর মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে ভারতীয় তরুণেরা যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে। আমি দেখতে পারছি ৩০ পার্সেন্ট ভারতীয় তরুণ উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে পারবে। বর্তমানে ১০ পার্সেন্ট তরুণের এই যোগ্যতা আছে। শিল্প আর কৃষি সেক্টরে বাকী ৭০ পার্সেন্ট তরুণ উচ্চযোগ্যতা সম্পন্ন দক্ষতা অর্জন করতে পারবে ।

৮. সরকারের ১০০ কোটি রুপি আইআইএসসি তে বিনিয়োগ করার প্রসংশনীয় উদ্যোগ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

এটা সরকারের প্রসংশনীয় উদ্যোগ। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকার আরো অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমি মনে করি এইসব উদ্যোগের ফলে বিপুল সংখ্যক তরুণদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ হবে।

৯. সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের সায়েন্স ল্যাব থেকে দাবি করা হয় যে ন্যানোটেক্নোলজি, বায়োটেক্নোলজি, কার্বন কমপোজিট, মেটালরজি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারতে বিশ্বমানের গবেষণা কর্ম চলছে। এ সত্বেও আমরা গত ষাট বছরে দেশে বড় কাজের সাফল্যের জন্য একটিও নোবেল পুরস্কার লাভ করা যায় নি। প্রশ্ন উথাপিত হয়েছে সত্যি কি আমরা বিশ্বমানের গবেষণা চালাতে পারছি। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

মৌলিক গবেষণার সাফল্যের জন্য অধিকাংশ নোবেল প্রাইজই দেওয়া হয়। বর্তমানে মৌলিক গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করা হয়। এখন আমাদের প্রয়োজন তরুণদের মধ্যে সৃজনশীল গবেষণা কর্ম পরিচালনা করার। বহুমুখী ক্ষেত্রে গবেষণা না চালিয়ে সুনির্দিষ্ট মৌলিক ক্ষেত্রে গবেষণা চালানো প্রয়োজন। আমি ন্যানোটেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি এবং ইনফরমেশন টেকনোলজির উপর কাজ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলাম। ভারতে বড় ধরনের কাজের ক্ষেত্রও আছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় ফান্ড সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। অধিক সংখ্যক রিচার্স স্টুডেন্টদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। দেশীয় প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আবিষ্কারমূলক গবেষণার ফল পাওয়া যেতে পারে। কিছু কিছু গবেষণা কর্ম আছে যেগুলো থেকে পুরস্কার পাওয়া যেতে পারে। আমি এখানে আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই গবেষণার পরিবেশের জন্য কেন সায়েন্টিফিক ম্যাগনানিমিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সায়েন্টিফিক ম্যাগনানিমিটি : নোবেল লরেটি প্রফেসর নোরম্যান ই বোরলাগ প্রখ্যাত কৃষি বৈজ্ঞানিক ও ভারতের প্রথম সবুজ বিপ্লবের একজন সহযোগী। ২০০৫ এর ১৫ মার্চ তিনি নতুন দিল্লির বিজ্ঞানভবনে এম.এস.স্বামীনাথন পুরস্কার গ্রহণ করতে এসে নব্বই বছর বয়সী প্রফেসর বোরলাগ সেখানে উপস্থিত প্রত্যেককে অভিনন্দিত করেন। তিনি তার বক্তৃতায় ভারতের কৃষি ভিত্তিক বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতির কথা তুলে ধরেন। তিনি গর্বের সাথে স্মরণ করেন যে পলিটিক্যাল ভিশনারী সি. সুব্রামনিয়াম ও ড. এম. এস. স্বামীনাথন ভারতের প্রথম সবুজ বিপ্লবের প্রধান স্থপতি। ড.ভারঘেস কুরিয়েন ভারতে শ্বেত বিপ্লবের ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি শ্রোতাদের মধ্যে বসে ছিলেন। তিনি ড. রাজা রামকে গম বিশেষজ্ঞ, ড. এস. কে. বাসালকে ভূট্টা বিশেষজ্ঞ, ড. বি. আর. বারওয়ালকে বীজ বিশেষজ্ঞ হিসাবে চিনতেন ও জানতেন । তিনি বললেন এইসব বিশেষজ্ঞরা ভারত এবং এশিয়ার কৃষিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ড. বোরলাগ তাদেরকে শ্রোতাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি আগে কখনো এমন দৃশ্য আমাদের দেশে দেখি নি। প্রফেসর নোরম্যান ই বোরলাগের এই কাজকে আমি সায়েন্টিফিক ম্যাগনিমিটি বলতে পারি।

১০. আপনি কি মনে করেন বন্ধু রাষ্ট্র সমূহে প্রেসিডেন্সিয়াল ভিজিটের মাধ্যমে কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে নাকি সেগুলো শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ভিজিট ছিল?

প্রত্যেকটা সফরেরই ভিত্তি ছিল ভারত কী অর্জন করতে চায় সেটাই বলা। আমি চৌদ্দটা দেশ সফর করি এবং তাদের অ্যাসেম্বলি ও পার্লামেন্টে ভাষণ দেই। সফর গুলোর ফলে উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় এবং সহযোগিতার দ্বার খুলে যায়। উদাহরণ হিসাবে আমি সাউথ আফ্রিকার প্যান আফ্রিকান পার্লামেন্টের ভাষণের কথা বলতে পারি। সেখানে আমি প্রাথমিকভাবে ৫০ মিলিয়ন ডলারের প্যান আফ্রিকান ই-নেটওয়ার্কের প্রস্তাব রাখি। সেই প্রস্তাব

তারা গ্রহণ করে, আমি একে আমার সফরের প্রধান সাফল্য বলে মনে করি। আমার সুদান সফরের ফলে ওএনজিসি পাইপলাইন প্রোজেক্ট গৃহীত হয়। এর ফলে উভয় দেশই উপকৃত হয়েছে। আমার সফরের ফলশ্রুতিতেই ফিলিপাইন আমাদের দেশ থেকে জাত্রোফার চারা তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সেই চারা রোপন করে। এছাড়াও ফিলিপাইন ফার্মা ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমাদের একটা চুক্তি হয়। এর ফলে আমাদের জনগণ ক্রয়ক্ষম মূল্যে ওষুধ কিনতে পাচ্ছেন। আইটি, আইটিইএস আর বিপিও এর কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে এনএএসএসসিওএম ফিলিপাইনের সাথে কাজ শুরু করেছে। তানজিনিয়া সফরের ফলে আমরা বিপুল সংখ্যক হার্ট পেশেন্ট বিশেষ করে শিশুরা উপকৃত হয়েছে। আমি এটা জানিয়ে আমার খুশির কথা ব্যক্ত করতে পারি যে ওইসব শিশুদেরকে চিকিৎসার জন্য ভারতে নিয়ে আসা হয়। এর সাথে তানজিনিয়ার ডাক্তারও হৃদরোগের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে ভারতে আসেন। সিংগাপুর ও সাউথ কোরিয়ায় আমার সফরে আমি একটি ওয়ার্ল্ড নলেজ প্লাটফরম গঠনের প্রস্তাব রাখি। এই দেশগুলো আমার প্রস্তাব বিবেচনা করতে রাজি হয়।

১১ আপনি আপনার টার্মে বেশ কয়েকটা প্রোজেক্ট বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেন। সেই সব প্রোজেক্ট বাস্তবায়ন সম্পর্কে আপনি কি সন্তোষজনক মনোভাব পোষণ করেন? পিইউআরএ -এর মতো প্রোজেক্টের কথা বলতে পারি কি?

আমি বেশ কয়েকটি সন্দোষজনক প্রোজেক্টের কথা বলতে পারি।

গ্রাম উন্নয়ন : মিনিস্টিরি অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট ৩৩ **পিইউআরএ** ক্লাস্টার সারাদেশব্যাপী স্থাপন করেছে। গ্রাম উন্নয়নের জন্য **পিইউআরএ** বেশ কিছু প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সংস্থায় কার্যক্রম চালু করেছে।।

এনার্জি : পাঁচটা রাজ্যে জাত্রোফা চাষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বায়োডিজেল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে।

নলেজ গ্রিড : ন্যাশনাল নলেজ কমিশন (এনকেসি) গঠন করা হয়েছে। সারাদেশব্যাপী কমপক্ষে ৫,০০০ একাডেমিক ইন্‌স্টিটিউশন, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজগুলোতে ১০০ এমবিপিএস নেটওয়ার্ক চালুর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি : ১৫০ বছরের প্রাচীন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি চালু করা হয়েছে। আমি ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উদ্বোধন করে ২০,০০০ ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভাষণ প্রদান করেছিলাম।

ভিলেজ নলেজ সেন্টার : গ্রামের নাগরিকদেরকে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসেস ডেলিভারির লক্ষ্যে ১০০,০০০ কমন সার্ভিস সেন্টার মিনিস্টারী অব কমুনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি(এমসিআইটি) সেবাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ই-গভর্ন্যান্স : জাতীয় পরিচয়পত্র চালু করা হয়েছে । **জি২জি** এবং **জি২সি** সেবার জন্য ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভারত সরকার **জি২সি** ই-গভর্নেন্স সেবা এবং **এসডবলুএএন** (স্টেট ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক) স্থাপন করেছে।

১২ আপনি কি আপনার বিশাল মেধা, ধীশক্তি এবং আত্মত্যাগ মানুষের সেবায় নিবেদন করেছেন? গাইডিং সায়েন্স রিচার্স এন্ড টিচিং ডক্টোরাল কি স্টুডেন্টদের জন্য ব্যয় করতে চান? আপনি কি আপনার আগের শিক্ষকতায় আন্না ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যাবেন?

আমি ২০২০ এর আগে ভারতকে উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমি শিক্ষা আর রিচার্স এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবো। ছাত্রছাত্রী এবং

তরুণদের সাথে আমি মতবিনিময় করেছি। আমি প্রত্যেক বছর সুযোগ পেলেই উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন এলাকাতে সময় কাটাই। এলাকার তরুণ সমাজের উন্নয়নের জন্য আমি কাজ করে যাব।

১৩. সুচারুরূপে আপনার কাজকর্ম চালাতে গিয়ে আপনি কখনো সবচেয়ে হতাশার মধ্যে পড়েন কিনা তা ব্যক্ত করবেন কি?

আমাদের দেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমি আশাবাদী। উন্নয়নই আমার ধ্যানজ্ঞান । যদি সব মানুষ একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের দেশের তরুণ সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যায় তবে ইন্ডিয়া ২০২০ এর লক্ষ্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। আমাদের প্রত্যেককেই মানুষের চেয়ে দেশ বড় এই উদ্দীপনায় কাজ করে যেতে হবে। আমাদের দেশের ৫৪০ মিলিয়ন তরুণদের প্রতি আমার প্রগাঢ় আস্থা আছে ।

১৪. আপনি উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলো সফর করে তাদের উন্নয়নের জন্য রোডম্যাপের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সব রাজ্যেই বহু বিদ্রোহী গ্রুপ সক্রিয় আছে, যারা বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করছে । বিনিয়োগের অভাবে তরুণ সমাজের মধ্যে হতাশার জন্ম হচ্ছে। বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর এই তৎপরতার ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে উত্তর ভারতে ভোগান্তিতে পড়া মানুষদের জন্য আপনি কী আশার বাণী শোনাবেন?

উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলো আমাদের জন্য অবদান আর চ্যালেঞ্জ দুটোই রেখে আসছে। আমি দেখতে পেয়েছি, জনগণ বুঝতে সক্ষম হচ্ছে যে বিদ্রোহীরা তরুণ সমাজের ভবিষ্যতকে বাধাগ্রস্ত করছে। উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর জন্য উন্নয়নের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণ আত্মত্যাগ করার জন্য এবং উন্নয়নের বাধাকে অতিক্রমের উদ্দেশ্যে এক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে প্রস্তুত

বলে আমার মনে হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ম্যাসেজ পাঠাতে চাই রাজ্যের তরুণদের কাজ দেবার লক্ষ্যে উদ্যোগী প্রকল্প গ্রহণ করা হোক। বিদ্রোহী এবং সন্ত্রাসী ক্রিয়াকলাপকে নির্মূল করার জন্য দক্ষ, জ্ঞানী তরুণ আর ব্যবসা- উদ্দ্যোক্তাদেরকে কাজের সংস্থান অবশ্যই করতে হবে।

১৫. উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর সাথে পূর্ব ভারতের ব্যবসা, যোগাযোগ ও রেলপথ স্থাপন সম্বন্ধে আপনার মতামত কী? এগুলোর উন্নয়ন ঘটালে অর্থনীতি এবং চাকুরীর পথ সুগম হবে কি?

উন্নয়নের স্বার্থে অবশ্যই এসব বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। পলিটিক্যাল সিস্টেম অতি তাড়াতাড়িই উত্তর ভারতের সাথে পূর্ব ভারতের ব্যবসা, যোগাযোগ আর রেলপথ স্থাপনের দ্বার খুলে দিতে পারে। আমি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃপক্ষের সাথে সীমান্ত বাণিজ্য উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই পথ সুগম হলে তরুণদের চাকুরী প্রাপ্তি তরান্বিত হবে।

১৬. আপনি আপনার বক্তব্যে বলেছিলেন যে আমাদের এনার্জি সেক্টরকে প্রচলিত উৎস থেকে অপ্রচলিত উৎসে স্থানান্তর করা হবে রাষ্ট্রপতিভবন কি এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত রাখবে?

সবেমাত্র দেশ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সৌরশক্তি পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। রাষ্ট্রপতিভবন ৫এমডবলু সৌর প্লান্ট এর কথা বলেছে। মিনিস্টিরি অব পাওয়ার এবং মিনিস্টিরি অব নন কনভেনশনাল সোর্সেস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে ।

১৭. এনার্জি সমস্যা মোকাবিলা করে সারাদেশে সোলার এনার্জি, উইন্ড এনার্জি, টাইডাল এনার্জি ইত্যাদি উৎস থেকে বিদ্যুত উৎপাদনের ব্যবস্থা নেবার পদক্ষেপ কি আপনি নিতে চাচ্ছেন?

আমার বক্তৃতায় আপনি লক্ষ্য করেছেন আমি পরামর্শ দিয়েছি সোলার এনার্জির উপর রিচার্স চালাতে যাতে সিএনটি (কার্বন ন্যানোটিউব) ভিত্তিক সোলার ফটোভোলটিক সেলস স্থাপন করে সোলার পাওয়ার প্লান্টের উন্নয়ন সাধন করা যায়। থোরিয়াম ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার পাওয়ার এর ব্যবস্থা করার জন্যও আমি পরামর্শ দিয়েছি। যোগাযোগ সুবিধা আছে এমন এলাকাতে বায়ো-ডিজেল উৎপাদনের জন্য ব্যাপকভাবে জাত্রোফা গাছের চাষ করার পরামর্শও আমি দিয়েছি। আমাদের বিজ্ঞানীরা এইসব ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করে চলেছেন।

তিনটি এনই রাজ্য সফরের ফলে আমার মধ্যে হর্টিকালচার, ফুড প্রসেসিং এবং গার্মেন্টস শিল্পের উপর বিশেষ আস্থা গড়ে উঠেছে। রাজ্যগুলো সফর করে ওই রাজ্যগুলোর তরুণদের সাফল্যের প্রত্যাশায় আমি বিশেষভাবে আশান্বিত হয়েছি। তরুণদের মধ্যে উন্নয়নের স্পৃহা জাগিয়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। সেই সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার অবকাঠামোর কথাও এসে যায়। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা বর্হিজগতের সাথে তাদের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠলে স্বাভাবিক নিয়মেই রাজ্যগুলোর উন্নতি ঘটবে।

পরিশিষ্ট-২

মিশন মোড বাস্তবায়ন

আমার বক্তৃতায় অফিস অব প্রেসিডেন্ট স্থাপন সম্পর্কে আমি আগেই উল্লেখ করেছি। আমি পার্লামেন্টকে শক্তিশালী করার জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। আমি পরামর্শ দিলাম যে প্রত্যেকটা দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য/লক্ষ্য এবং চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট ও সরকারকে যৌথভাবে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছি। প্রয়োজনীয় পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারসিপের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠানের সীমা অতিক্রম না করে একটা সময়ের মধ্যে সম্পদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে 'মিশন মোড' বাস্তবায়নের জন্য ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে। আমি আশা করেছিলাম যে পার্লামেন্টের ধীমান সাংসদদের থেকে এইসব মিশনের কাঙ্খিত নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। এই পন্থায়, সমস্ত সাংসদরা পার্টি লাইন পেড়িয়ে কার্যকর গভার্ন্যান্স গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন।

মিশন ব্যবস্থাপনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো

অগ্রবর্তী এলাকাগুলোয় মিশন ব্যবস্থাপনার জন্য মডেল গ্রহণ করা যেতে পারে। এ জন্য যা যা আমার কাছে দৃশ্যমান হলো–

* মনোনীত সাংসদরা মিশনগুলোর সমন্বয় সাধন করলে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মিনিস্টার তার বিভাগের এখতিয়ার লঙ্ঘন না করে সরাসরি একই মিশনের জন্য নেতৃত্ব দান করবেন ।

* ক্যাবিনেট মিনিস্টার মিনিস্টিরি / বিভাগীয় রিসোর্স এর প্রতিনিধিত্ব করবেন 'মিশন মিনিস্টার' হিসাবে । তিনিই পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন তার মিশনের বাৎসরিক কার্যক্রম ও আর্থিক বিষয়ে।

ইন্ডিয়া ২০২০ ভিশনকে বোঝার জন্য ম্যাট্রিক্স স্ট্রাকচার অব মাল্টিপ্‌ল এর একটা ধারণামূলক স্কেচ নিম্নে দেওয়া হলো।

মিশন মোড ব্যবস্থাপনার জন্য একটা মন্ত্রণালয় কিংবা বিভাগের বাজেটের ১৫ থেকে ২৫ পার্সেন্ট প্রয়োজন, যা বিকেন্দ্রীয়করণ বা অভ্যন্তরীণ ব্যয় বরাদ্দের জন্য মিশনভিত্তিক হতে হবে। একটা নির্দিষ্ট মিশনের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের দায়দায়িত্ব থাকবে সেক্রেটারি / ডাইরেক্টর পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তার উপর। মিশন মিনিস্টার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে আসা কতিপয় জেএস / ডাইরেক্টরদের নিয়ে একটা টিম গঠন করে তাদেরকে মিশনের লক্ষ্য সুসম্পন্ন করার জন্য দায়িত্ব দিবেন। মিশন ব্যবস্থাপনা টিমের প্রত্যেক সদস্য প্রশাসনিকভাবে ক্যাবিনেট মিনিস্টারের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, অন্যদিকে কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকবেন মিশন ম্যানেজারের কাছে।

এ থেকে সহজভাবেই দৃশ্যমান হবে যে সাংসদরা কার্যত মেট্রিক্স ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাদের থাকা প্রয়োজন হবে নিম্নোলিখিত প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শ এবং দায়দায়িত্ব।

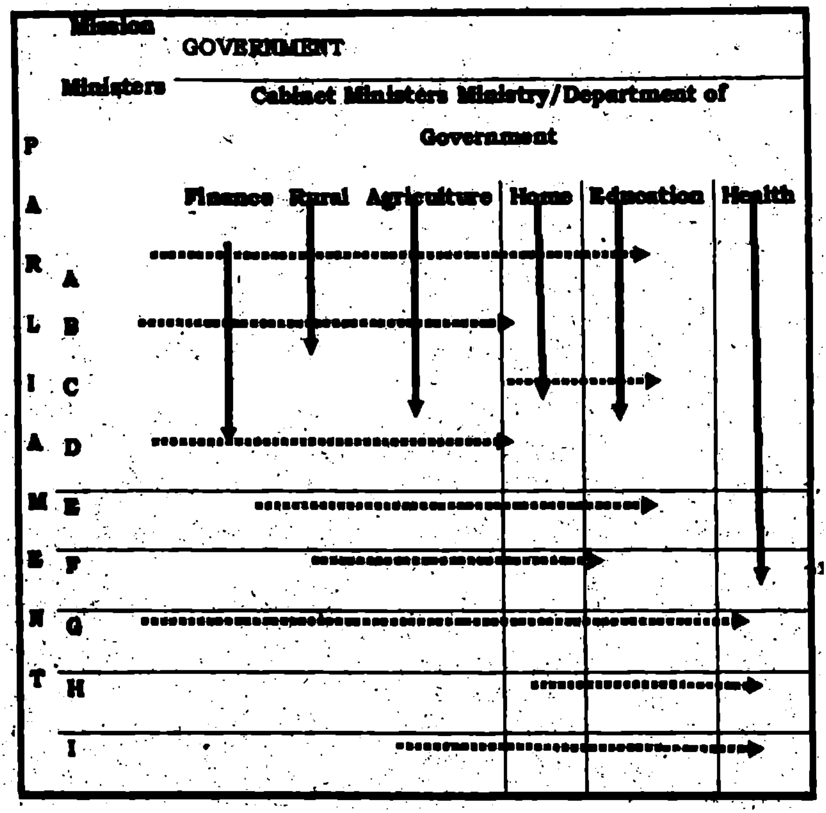
Mission
Ministers
GOVERNMENT
Cabinet Ministers Ministry/Department of Government
Finance
Rural
Agriculture
Home
Education
Health
P
A
R
L
I
A
M
E
N
T
A
B
C
D
E
F
G
H
I

এ. রাজ্য কিংবা পার্লামেন্ট থেকে আসা মিনিস্টাররা মিশন মিনিস্টার হতে পারবেন।

বি. নির্দিষ্ট মিশন, প্রোগ্রাম এবং প্রোজেক্টের জন্য ক্যাবিনেট মিনিস্টারদের দ্বারা মিশন মিনিস্টাররা হবেন শীর্ষ ডেলিগেশন

সি. মিশন মিনিস্টারদের দ্বারা একটা নির্দিষ্ট মিশনের আনুভূমিক সমন্বয়ের সাথে ব্যবস্থাপনা টিমের মাধ্যমে বিভাগীয় সীমানা অতিক্রম করবে।

ডি. প্লানিং কমিশন ও প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে ইন্ডিয়া ২০২০ ভিশন প্লানিং টিম গঠিত হবে।

ই. প্রত্যেক মন্ত্রণালয় এবং মিশন-প্লানিং টিম থেকে সচেতনভাবে কমপ্রিহেনসিভ ভিশন ২০২০ প্লান প্রস্তুত করতে হবে।

এফ. মিশনকে দেওয়া সম্পদগুলো আদ্যন্ত ব্যবহার করতে হবে। মিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি পেতে পারে পার্লামেন্ট ও সরকারের মেয়াদের ভিত্তিতে।

জি. ই-গভার্ন্যান্স নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে হবে ব্যাপকভাবে।

এইচ. মিশন মিনিস্টাররা সরাসরি পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

আই. ক্যাবিনেট মিনিস্টাররা দায়বদ্ধ থাকবেন ক্যাবিনেটের কাছে, ক্যাবিনেট দায়বদ্ধ থাকবে পার্লামেন্টের কাছে।

জে. বিপুল সংখ্যক মিশন মিনিস্টার ইন্ডিয়া ২০২০ ভিশন মেট্রিক্স এর সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন। পার্লামেন্টের ভূমিকা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে। সুনির্দিষ্ট মিশনগুলোর জন্য পাবলিক অফিসের সংখ্যাও বাড়বে।

≈

গণতন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যা হোক, উন্নয়নের জন্য তাদের শুধুমাত্র যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রদর্শন উচিত নয়। তাদের সফল ব্যবহার নির্ভর করে সামাজিক মূল্যবোধ এবং জনসাধারণের ফলপ্রসূ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার কাঠামোর উপর দায়বদ্ধতার নিশ্চিতকরণের দ্বারা। তারপরই সময় আসে জাতীয় বিতর্কের জন্য পদ্ধতিগত পরিবর্তনের অনুঘটকরূপে ।

–সমাপ্ত–

সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের সময় তোলা ছবি

দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে

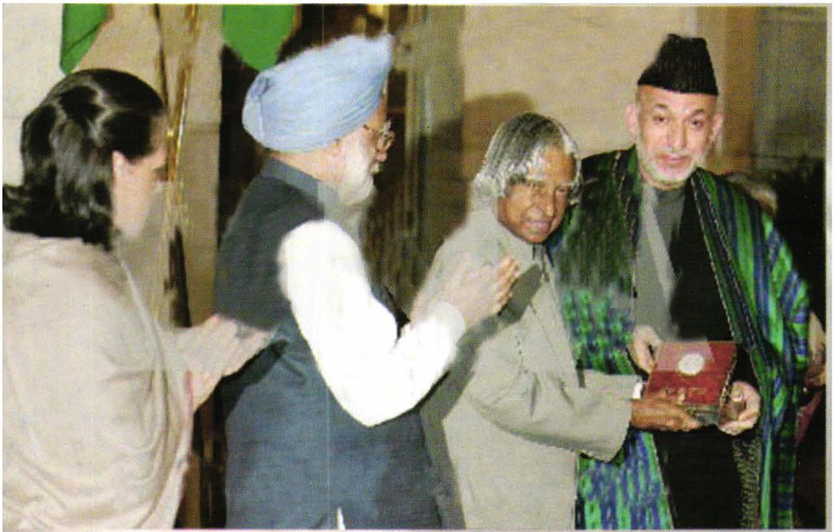

আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই, ড. মনমোহন সিং ও সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী সিমন পেরেসের সাথে

সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের সঙ্গে আমি

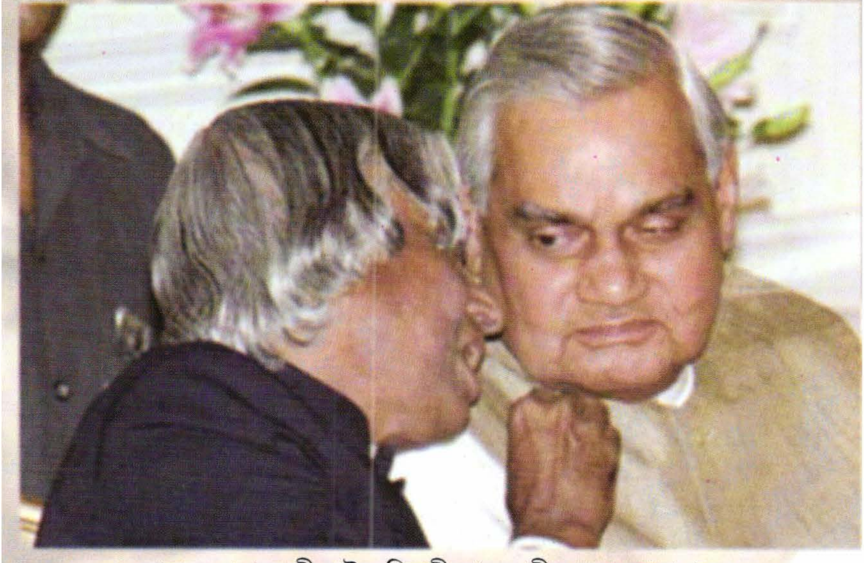

সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে আলাপরত

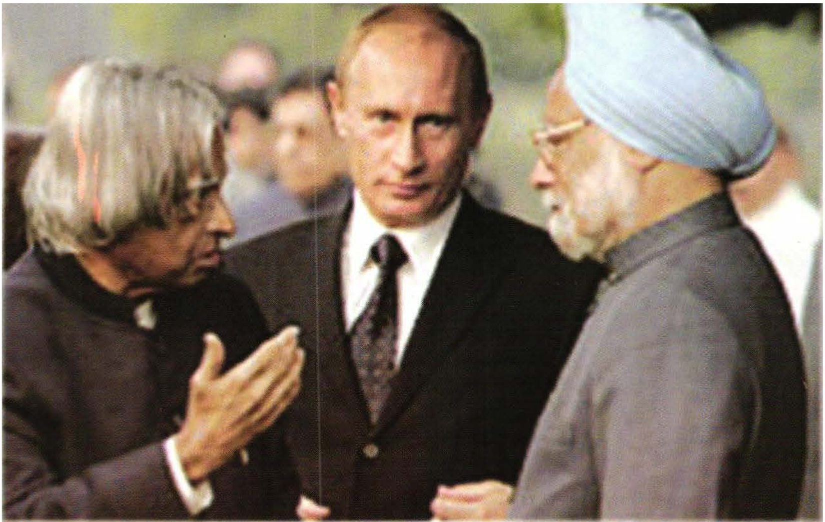

প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও আমি

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এর সাথে

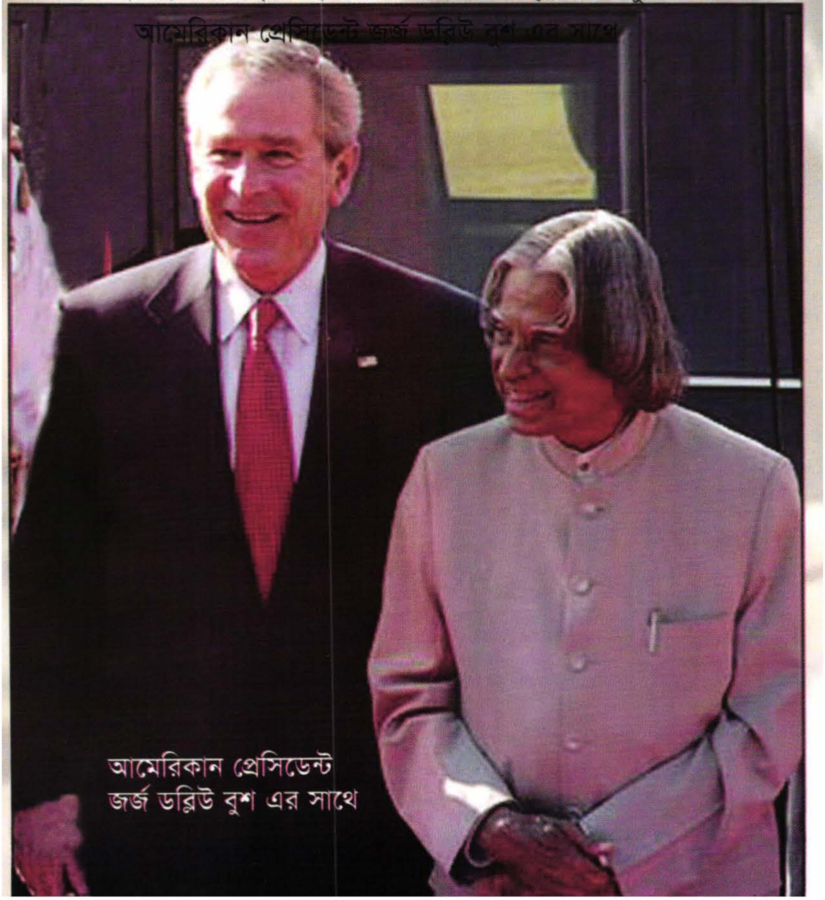

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট
জর্জ ডব্লিউ বুশ এর সাথে

আন্না ইউনিভার্সিটিতে সহকর্মীদের সাথে

২০০৭ সালের নির্বাচনের পরে সরকার গঠনের প্রস্তাব নিয়ে ড. মনমোহন সিং, সোনিয়া গান্ধী আমার বাসভবনে আসেন

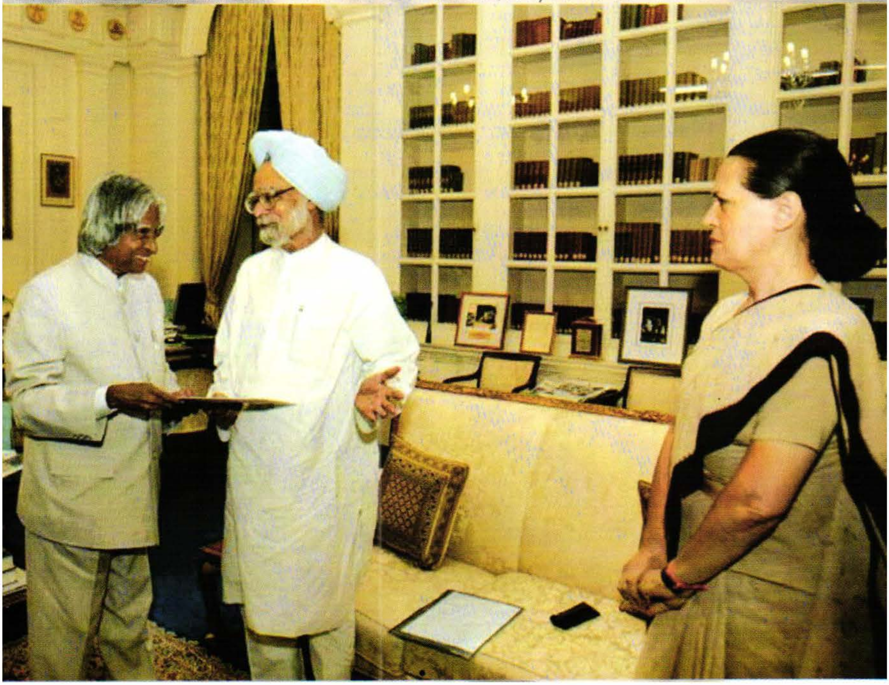

নরেন্দ্র মুদির সাথে একান্ত মুহূর্তে

Coll
CALICUT
MEDICAL

কালিকাট মেডিকেল হলে ভাষণরত আমি পিছনে আমার স্কেচ

বিদেশী অতিথিদের সাথে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ও আমি

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফকে একটি ভগবত গীতা গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ধর্মজাজক

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আলাপরত

বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আলোচনায়

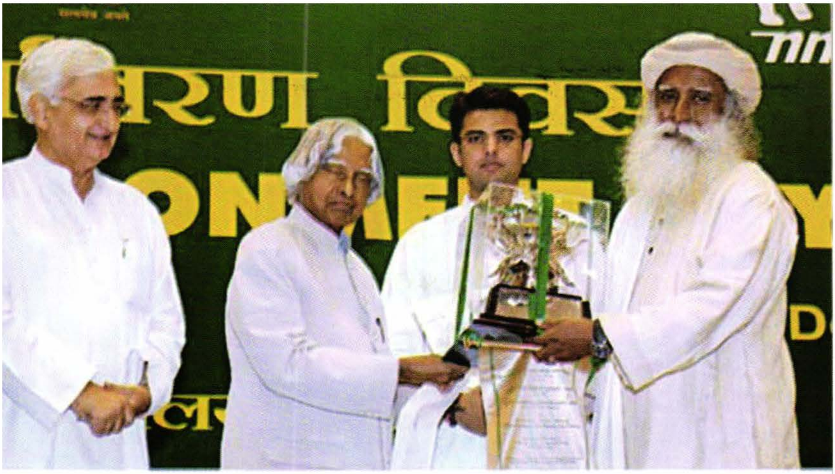

FROM LEFT:- SHRI. SALMAN KURSHID - UNION MINISTER OF STATE FOR CORPORATE AFFAIRS, DR. A.P. J. ABDUL KALAM - FORMER PRESIDENT, SHRI. SACHIN PILOT - UNION MINISTER OF STATE FOR MINORITY AFFAIRS AND SADHGURU J VASUDEV - FOUNDER, ISHA FOUNDATION. SADHGURU RECEIVES INDIRA GANDHI PARYAVARAN PURASKAR FROM DR. A.P.J. ABDUL KALAM.

শিশুদের সাথে প্রতিভা পাতিল ও আমি

একটি সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে

লাল গোলাপ ফুল দিয়ে নিতিশ কুমার আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে

বিমান বাহিনীর প্যারেড অনুষ্ঠানে

পত্রিকা হাতে অফিসকালীন সময়

রাজনৈতিক নেতাদের সাথে

ছোট শিশুরা ঢোল বাজিয়ে স্বাগত জানায়

স্কুলের শিশুদের সাথে

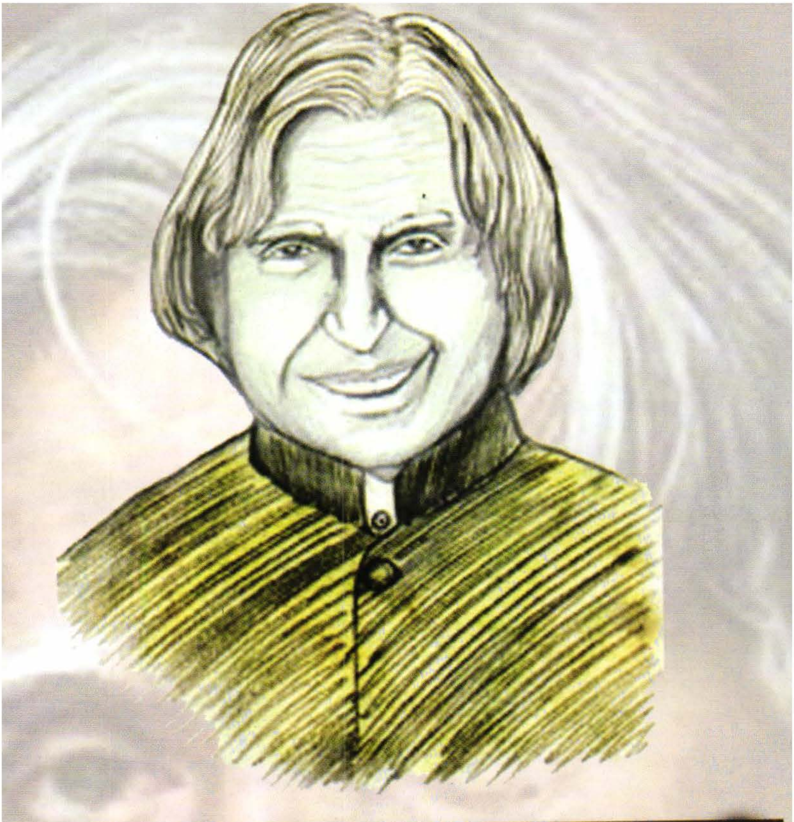

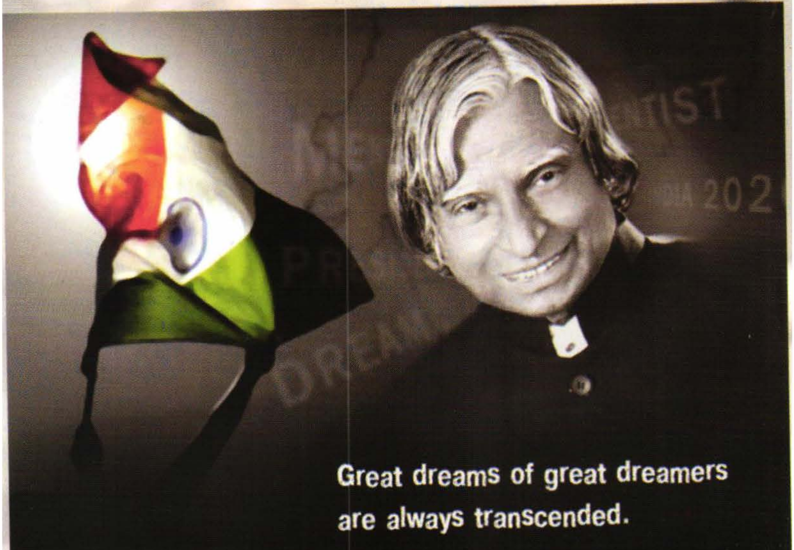

Great dreams of great dreamers
are always transcended.

সাধারণ পরিবারের ছেলে-মেয়েরা ফুল দিয়ে আমাকে স্বাগত জানায়

২০০৬ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে

ছোট্ট স্কুল ছাত্রীর সাথে
কথা বলার সময়

আব্দুল পাকির জয়নুলাবদিন আবদুল কালাম জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৩১ সালে, ভারতের তামিল নাড়ু রাজ্যের রামেশ্বরমে। তার অল্প শিক্ষিত পিতা ছিলেন নৌকার মালিক। প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানী হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন কালাম এবং পরবর্তী সময়ে অসামান্য অবদানের জন্য ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'ভারতরত্ন' অর্জন করেন। এই পরমাণু বিজ্ঞানী ব্যক্তিগত জীবনে দৈনিক ১৮ ঘন্টা কাজ করেন, এবং বীণা বাজাতে পারেন চমৎকার। তিনি ছিলেন চেন্নাইয়ের আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে টেকনোলজি অ্যান্ড সোসাইটাল ট্রান্সফর্মেশনের অধ্যাপক। ড. কালাম ভারতের ১১তম রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট আহমেদাবাদ ও ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ইন্দোর-এর ভিজিটিং প্রফেসর এবং ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর।

মূল্য : দুইশ' টাকা মাত্র

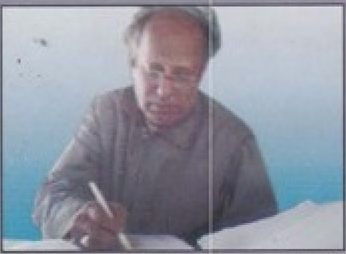

মনোজিৎকুমার দাস সাহিত্যের নানা শাখায় লেখালেখিতে স্বচ্ছ। লালন-রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত কুষ্টিয়া শহরের কোটপাড়া মাতুলালয়ে ৪ নভেম্বর ১৯৪৭ সালে মনোজিৎকুমার দাসের জন্ম। পিতা : মোহিতকুমার দাস, মাতা : দুর্গারানী দাস। পৈতৃক নিবাস মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার মাশালিয়া গ্রামে। তিনি নবোদয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ঝিনাইদহের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর নেবার পর লেখালেখির সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত আছেন। তিনি মূলত অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, কবি ও গল্পকার। তিনি উপন্যাসও লিখে থাকেন। তিনি ২০১১ সালে দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা, কুষ্টিয়ার রজতজয়ন্তী সম্মাননা এবং নগুর শিল্প সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সম্মাননা পুরস্কার লাভ করেন। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সালে জাগরণী সাহিত্য সংসদ, কুষ্টিয়া তাঁকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করে।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় বিশ। গ্রন্থগুলো হল *কাব্য :* অতন্দ্রিলা জেগে নেই (২০০৩), আমিও নীলকণ্ঠ হতে চাই (২০১২); *শিশুতোষ গল্প সংকলন :* ভূতের রাজ্যে সন্তুমামা (২০০৫), গেছো ভূত ও মেছো ভূতের লড়াই (২০০৯); *মুক্তিযুদ্ধের গল্প সংকলন :* একাত্তরের কান্না (২০১০); *গল্প সংকলন :* শ্রাবণ রাতে পূর্ণিমার চাঁদ (২০০৯); *প্রবন্ধ সংকলন :* রবীন্দ্রনাথের আলোর বাণী (২০০৯), বাতাসে ছাতিম ফুলের গন্ধ (২০০৯); *অনূদিত উপন্যাস :* ইংলিশ পেশেন্ট (২০০৮), সোয়ান ইন লাভ (২০০৮), দ্য লস্ট সিম্বল (২০০৯) যৌথভাবে। *অনূদিত আত্মজীবনী :* লিপ অব ফেইথ- কুইন নূর (২০১১); *অনূদিত জীবনী :* ইন্দিরা (২০১১) যৌথভাবে, সোনিয়া (২০১২)। *অনূদিত গল্প সংকলন :* বিদেশী প্রেমের গল্প (২০০৭), নোবেল বিজয়ী লেখকদের নির্বাচিত গল্প সংকলন (২০০৯), ভারতীয় লেখিকাদের গল্প (২০১২)

ইংরেজি ভাষার গ্রন্থ : Verses : Poetic Dream (2012),
Translated Verses : Shadow (2012)
উপন্যাস : নদীর নাম হানুমতি (অপ্রকাশিত)

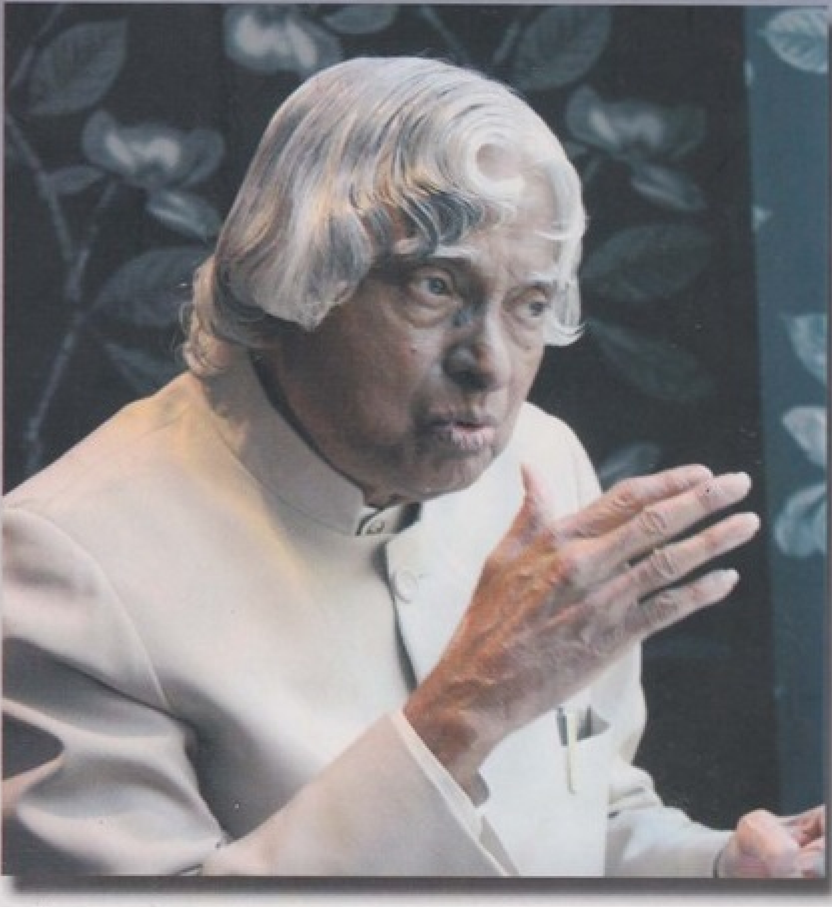

এ.পি.জে. আবদুল কালাম
টার্নিং পয়েন্টস
অনুবাদ : মনোজিৎকুমার দাস
প্রচ্ছদ : মূল প্রচ্ছদ অবলম্বনে
তাহমিদা খাতুন